অল কোয়ায়েট অন্‌ দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট

অনুবাদক

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফ্রন্ট থেকে পাঁচ মাইল তফাতে আজ আমরা আরাম করছি। গতকাল সেখানে অন্যদল যাওয়াতে আমরা রেহাই পেয়েছি। একপেট মাংস আর মটরশুটি খেয়ে আমরা এখনকার মতো নিশ্চিন্ত। বিকেলের জন্যে সকলেই পুরো এক পাত্র করে খাবার পেয়ে গেছি, তা ছাড়া প্রত্যেকের ভাগে সসেজ আর রুটির ডবল খোরাকও জুটে গেছে। এমনটি রোজ হলে বেশ ফুর্তিতে থাকা যায়—কপালে এমন খাওয়া বহুদিন জোটেনি। ইয়াডেন আর ম্যুলের এর উপরেও আরও দু'বাটি করে খাবার নিয়েছে। ইয়াডেন নিয়েছে সে পেটুক বলে, আর ম্যুলের ভবিষ্যতের জন্যে পুঁজি করে রাখছে। এ ছাড়া জন-পিছু দশটা চুরুট, কুড়িটা সিগারেট আর দোক্তা। মন্দই বা কি! আমি কাট্‌সিন্সকির সিগারেটের সঙ্গে আমার দোক্তা বদল করে নেওয়াতে আমার হাতে হল চল্লিশটা সিগারেট। একদিনের পক্ষে এই যথেষ্ট। অবশ্য এইরকম ভরপুর খোরাক যে আমাদের প্রায়ই জোটে তা নয়। প্রুশিয়ানরা অতটা দিলদরিয়া নয়—সহজে উপুড়হস্ত করতে চায় না। আমাদের এই যে কপাল খুলে গেছে এর মূলে আছে যমের ভুল। হপ্তা

দুই আগে তখন আমরা মহড়ার ফৌজদের হয়ে বদলি খাটছি। আমাদের দিকটা বেশ ঠাণ্ডাই আছে, কাজেই আমাদের কোয়ার্টার-মাস্টার পুরো দেড়শো জনের জন্তেই নিয়মিত খাবার পাঠান। বদলি-খাটার শেষদিনে ইংরেজদের অনেকগুলো কামান হঠাৎ একসঙ্গে আমাদের উপর গোলাবৃষ্টি করে দেড়শোর মধ্যে উড়িয়ে দিলে সত্তর জনকে—ফস্কে গেলুম আমরা এই ক'জন।

গত রাত্রে আমরা ফিরে এসে আরামে ঘুম দিয়েছি। কাট্‌সিন্সকি ঠিকই বলে—যদি আর একটু বেশি ঘুমোবার সময় পাওয়া যেত, তাহলে লড়াই জিনিসটা মন্দ হত না। ফ্রণ্টে থাকতে আমরা ঘুমুতে পাইনি বললেই হয়, আর একটানা একপক্ষ জাগরণ বড়ো সহজ কথা নয়।

তখন বেলা দুপুর—আমাদের আস্তানা থেকে আমরা গুটি গুটি বেরলুম। টিনের বর্তন হাতে রান্নাঘরের সামনে আমরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি। রান্নার খোস্‌বোতে জিভে জল আসছে। সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে পেটুকের শিরোমণি আলবের্ট ক্রোপ—আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান; সেই আমাদের মধ্যে সবার আগে লান্স্‌ কর্পোরাল হবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ম্যুল্যের এখনও তার সঙ্গে ইস্কুলের বই নিয়ে ফিরছে, কারণ এখানেও সে তার পরীক্ষার কথা ভাবে আর যখন গোলাবর্ষণ শুরু হয়, বিড়বিড় করে পদার্থ-বিজ্ঞানের পাঠগুলো আওড়াতে থাকে। লেএআর এখন একমুখ দাড়িগোঁফ রেখে মাতব্বর বনে গেছে।' তারপর আমি পাউল বয়মের। আমাদের চারজনেরই বয়েস উনিশ বছর। ইস্কুলের একই শ্রেণী থেকে আমরা যুদ্ধের স্বেচ্ছাসেবকের দলে যোগ দিয়েছি।

আমাদের পিছনেই আমাদের অন্য বন্ধুরা—ইয়াডেন, আমাদেরই বয়সী, আগে সে চাবিওয়ালার কাজ করত। তার মতো খাইয়ে আমাদের দলের মধ্যে কেউ নেই। হাইএ ভেস্ট্‌হুস্‌—তার বয়সও ঐ—

তার কাজ ছিল মাটি কাটা। তারপর চাষী ডেটেরিং, সে কেবলই ভাবছে তার ক্ষেতখামার, তার স্ত্রীপুত্রের কথা। সবশেষে স্টানিস্লাউস্ কাট্‌সিন্সকি, আমাদের দলপতি—চতুর, ধড়িবাজ, কষ্টসহিষ্ণু, বয়স চল্লিশ বছর, সব রকম কাজেই ওস্তাদ।

রসুই আমাদের দিকে কোনও নজর দিচ্ছে না দেখে আমরা ক্রমেই অধীর হয়ে পড়ছিলুম। শেষে কাট্‌সিন্সকি তাকে ডেকে বললে—"ওহে হাইন্‌রিখ্, আর কেন, হাঁড়ার মুখটা খোলো—দেখাই তো যাচ্ছে রান্না হয়ে গেছে।"

সে হাই তুলে বললে—"আগে সবাই জড়ো হোক, তবে তো—"

—"আমরা সবাই এসেছি।"

রসুই তবুও কোনও খেয়াল করলে না, বললে—"তোমরা এলে কি হবে? বাকি সব কোথায়?"

—"তারা আজ আর তোমার হাতে খাবে না। তারা কেউ হাস-পাতালে, কেউ যমের বাড়ি নেমন্তন্ন রাখতে গেছে।"

এই কথাটা কানে যেতে রসুই যেন কেমন হতবম্ব হয়ে বলে উঠল—"সে কি! আমি যে দেড়শো লোকের খানা বানিয়ে রেখেছি!"

ক্রোপ কনুই দিয়ে তাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে—"তাহলে অনেক দিন বাদে আজ পেট ভরে খেতে পাব। নাও আরম্ভ কর।"

ইয়াডেনের চোখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে মুখ কচলাতে কচলাতে বললে—"তাহলে দেড়শো লোকের মতো রুটিও আছে?"

রসুইয়ের একেবারে বাকরোধ। সে অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়ল।

ইয়াডেন তার কাপড় ধরে টেনে বললে—"আর সসেজ?" রসুই আবার ঘাড় নাড়ল।

ইয়াডেন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—"দোক্তা, চুরুট?"

—"হ্যাঁ, সমস্ত।"

ইয়াডেন আনন্দে লাফিয়ে উঠল—"কি মজা! প্রত্যেকে তাহলে পাচ্ছে—রোসো হিসেব করি—প্রায় ডবল খাবার।"

রসুই বলে উঠল—"উঁহু, সেটি হচ্ছে না।"

আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠলুম—"কেন! কেন! হবে না কেনরে বিট্‌লে বুড়ো?"

—"দেড়শো লোকের খাবার আশিজন লোককে দেওয়া যেতে পারে না।"

ম্যুলের গর্জে উঠল—"আচ্ছা, দেখাচ্ছি দেওয়া যেতে পারে কি না!"

রসুই বললে—"যাক, আঁকনিটা না হয় সবটাই দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাদ বাকি আমি আশিজনের মতো দেব।"

কাট্‌সিন্সকি চটে উঠল, সে বললে—"ওসব আশি-বিরাশি বুঝিনে; 'সেকেণ্ড কোম্পানির' জন্যে রান্না হয়েছে, বেশ, এই আমরা সেকেণ্ড কোম্পানি এখানে হাজির হয়েছি, নাও পরিবেশন শুরু কর।"

আমরা শেষটা রসুইয়ের সঙ্গে হাতাহাতির যোগাড় করে তুললুম। তার উপর কেউই সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ লড়াইয়ের সময় দু'বেলাই এই রসুইয়ের দোষে আমাদের খাবার দেরি করে ঠাণ্ডা হয়ে আসত। গোলাগুলির ভয়ে আমাদের 'লাইন'-এর অনেক পিছনে সে রসুইখানা তৈরি করত; সেই কারণে আমাদের খাবার যারা নিয়ে আসত তাদের অন্য অন্য কোম্পানির তুলনায় অনেক বেশি হাঁটতে হত। ফার্স্ট কোম্পানির রসুই এর তুলনায় অনেক ভালো। যদিও সে নিজে মোটা মানুষ, কিন্তু তার রান্নার সরঞ্জাম সে একেবারে ফ্রন্ট অবধি নিয়ে যেত।

গোলমাল শুনতে পেয়ে আমাদের কোম্পানি কমাণ্ডার সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি হাঁড়ার দিকে চেয়ে বলেন—"বাঃ, দিব্যি রান্না হয়েছে তো!"

রসুই ঘাড় নেড়ে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, মাংস আর চর্বি দিয়ে পাকানো হয়েছে কি না।"

কমাৰ্দা আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। আমাদের মনের মধ্যে কি হচ্ছে তিনি জানতেন, তিনি আরো অনেক কিছুই জানতেন। কারণ এককালে তিনিও আমাদের মতো সৈনিক ছিলেন। তিনি হাঁড়ার ঢাকাটা একটু সরিয়ে একটু শুঁকলেন, তারপর যাবার সময় বলে গেলেন—"সব খাবার বিলি করে দাও, আর আমার জন্যে এক প্লেট নিয়ে এস।"

ইয়াডেন আনন্দে ধেই ধেই করে রসুইয়ের চারপাশে নাচতে আরম্ভ করে দিল। রসুইয়ের মুখটা তখন যা দেখতে! এই রকম অবস্থায় সে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়। যেন বিশেষ কিছুই হয়নি, এই ভাবটা দেখাতে গিয়ে সে নিজের ইচ্ছায় একপোয়া কেমিক্যাল মধু আমাদের মধ্যে বেটে দিলে।

আজকের দিনটা বড়ো চমৎকার! ডাক এসে পৌঁচেছে; প্রত্যেকেরই নামে দুটো-তিনটে করে চিঠিপত্র, কাগজ এসেছে। আমরা আমাদের আস্তানার পিছনের মাঠটায় গোল হয়ে বসে তাশ খেলছিলুম। উপরে নীল আকাশ। বহুদূরে আকাশের সীমানায় হলদে রঙের 'অবজার-ভেশান বেলুন' রোদে চক্‌চক্ করছে, আর মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো মেঘের মতো উড়োজাহাজ-মারা-কামানের গোলার ধোঁয়া উড়ো-জাহাজের পিছনে সার বেঁধে তাড়া করছে। যুদ্ধক্ষেত্রের 'গোলমাল যেন বহুদূরের বজ্রের গর্জনের মতো কানে আসছে। আমাদের চারি-দিকের মাঠে পোস্তফুল বাতাসের দোলায় হেলছে দুলছে; আমাদের চুল বাতাসে উড়ছে; কত কি ভাবছি তার ঠিক নেই। নির্বিঘ্নে খেলা চলেছে, মনে হয় এমনি ভাবে বসে সারা জীবন কাটিয়ে দি।

বাসার দিক থেকে একটা টিনের বাঁশির সুর ভেসে আসছে। কামানের গুম্‌গুম্ শব্দে থেকে থেকে তাশ হাতে করে আমরা চমকে চারিদিকে

চেয়ে দেখছি। কেউ বলে ওঠে—"আরে বাস্‌রে!" কিংবা—"ওঃ একেবারে পায়ের কাছে এসে পড়েছে!" এক মুহূর্তের জন্যে আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। মুখে কিছু বলিনে, কিন্তু মনে মনে সকলেই বুঝি। আমরা এখন নিশ্চিন্ত মনে বসে আছি বটে, ঠিক এইখানে একটা গোলা এসে পড়লে এই মুহূর্তেই আমাদের আর কোনও চিহ্ন থাকবে না। দিকে দিকে সবই নবীন, সবই সতেজ, সুন্দর; রাঙা পোস্তফুল, ভালো খাবার, ভালো চুরুট এবং বসন্তের বাতাস—

ক্রোপ জিগগেস করলে—"সম্প্রতি কেমেরিখ্‌কে কেউ দেখতে গিয়েছিলে?"

আমি বললুম—"সে এখন সেণ্ট্‌ যোসেফ হাসপাতালে আছে।"

ম্যুলের বুঝিয়ে বললে—"কেমেরিখের উরুতে গুলি লেগেছিল, বেশ রীতিমতো জখম হয়েছে।"

আমরা ঠিক করলুম বিকেল বেলা গিয়ে তাকে দেখে আসব।

ক্রোপ একটা চিঠি বার করে বললে—"কাণ্টোরেক আমাদের সকলকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।"

আমরা হেসে উঠলুম। ম্যুলের তার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—"সে যদি এখানে থাকত বেশ হত।"

•

কাণ্টোরেক ব্যক্তিটি ছিলেন আমাদের ইস্কুলের মাস্টার। বেঁটে খাটো চটপটে মানুষ, মুখখানা ছুঁচোর মতো। ড্রিল করাবার সময় কাণ্টোরেক আমাদের লম্বা লম্বা লেকচার দিতেন; এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই বক্তৃতার ফলে আমাদের সমস্ত ক্লাশ ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্টের কাছে যুদ্ধের স্বেচ্ছা-সৈনিক হবার জন্যে নাম লিখিয়েছিল। আমি এখনও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি—চশমাজোড়া চকচক্‌ করছে, ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলছেন—"কমরেডরা, তোমরা কি যুদ্ধে যোগ দেবে না?"

এই সমস্ত মাস্টারদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন তাঁরা সব সময়েই তাঁদের কোটের পকেটের মধ্যে নানারকম মনের ভাব বহন করে বেড়ান; যখনই যেটা দরকার হয়, পকেট থেকে সেইটা বার করেন। কিন্তু তখন আমরা এতটা ভাবিনি।

ইওসেফ বেএম্ নামে আমাদের মধ্যে একজন ছিল যে আমাদের দলে আসতে ভারি ইতস্তত করেছিল। কিন্তু একঘরে হয়ে যাবার ভয়ে শেষটা সে-ও যুদ্ধের খাতায় নাম লেখালে। যদিও আমরা মুখে প্রকাশ করিনি, তবু এটা ঠিক যে তার মতো আমাদের অধিকাংশেরই মনে ভয় ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে প্রত্যেকের বাপ-মা পর্যন্ত নিজের ছেলেকে 'ভীরু' বলে লজ্জা দেবার জন্যে সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে সকলকেই যুদ্ধে যেতে হয়েছিল।

কি জন্যে যে আমাদের যেতে হচ্ছে এবং গিয়ে কি করতে হবে এ সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই বেশ স্পষ্ট ধারণা ছিল। সবাই জানত যে এটা একটা দুরদৃষ্ট—এর হাত থেকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

আশ্চর্যের বিষয় আমাদের মধ্যে যে প্রথম মারা গেল সে হচ্ছে সেই বেএম্ বলে ছোকরাটি, যে যুদ্ধে আসতে অনেকবার ইতস্তত করেছিল। একটা আক্রমণের সময় সে চোখে আঘাত পায়। মরে গেছে ভেবে আমরাই তাকে ফেলে আসি। তাকে সঙ্গে আনতে পারিনি কারণ আমাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। বিকেল বেলা হঠাৎ আমরা তার গলা শুনতে পেলুম, এবং দেখলুম মাঠের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে আমাদের দিকে আসছে। সে মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মাত্র। একে চোখ অন্ধ, তার উপর যন্ত্রণায় পাগল প্রায়। সুতরাং আড়ালে আড়ালে নিজেকে বাঁচিয়ে আসা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমরা কেউ গিয়ে তাকে নিরাপদ স্থানে টেনে আনবার আগেই বিপক্ষের গুলি তাকে শেষ করে দিলে।

কাণ্টোরেককে এর জন্যে আমরা দোষ দিতে পারিনে। কারণ প্রত্যেকটি মানুষকে যদি তার কাজকর্মের জন্যে দায়ী করে বিচার করতে হয় তাহলে পৃথিবী কোথায় থাকে! পৃথিবীতে ঐ রকম হাজার হাজার কাণ্টোরেক আছে, তাদের সবাই জানে যে ঠিক পথ একটি মাত্র আছে—এবং সে হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট পথ।

সেই জন্যেই এই সর্বনাশের পথে তারা আমাদের এই রকম করে ভুলিয়ে নামাতে পেরেছে।

আঠারো-উনিশ বছরের বালক আমরা—আমাদের পরিণতির পথে, কর্তব্যের পথে, ভবিষ্যৎ জীবনের পথে এই রকম লোকরাই হয় পথ-প্রদর্শক। আমরা প্রায়ই এদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করি—অথচ মনে মনে এদের উপর আমাদের আস্থা থাকে। কিন্তু যেদিন প্রথম মৃত্যুর ছবি আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল সেই দিনই এই বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেল।

আমাদের মেনে নিতে হল যে তাঁদের আমলের পুরনো মানুষদের চেয়ে আমাদের আমলের আজকের মানুষকেই বেশি বিশ্বাস করতে হবে। তাঁরা আমাদের চেয়ে বড়ো কেবল বাক্‌চাতুর্যে এবং ধূর্ততায়। প্রথম গোলাবর্ষণেই আমাদের ভুল ধরা পড়ল। মানব-জগতের যে-চিত্র তাঁরা আমাদের এঁকে দেখিয়েছিলেন তা এক মুহূর্তে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেল। তাঁরা যতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছেন, কলম চালাচ্ছেন, আমরা চোখের সামনে মানুষকে মরতে দেখছি। তাঁরা দেখাচ্ছেন, দেশের প্রতি কর্তব্যই সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। আমরা তার আগেই শিখেছি মৃত্যুযন্ত্রণা কি ভীষণ! এ সব সত্ত্বেও আমরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করিনি, আমরা ভীরুতা দেখাইনি। তাঁরা দেশকে যতটা ভালোবাসেন, আমরাও বাসি। আমরা সাহস করে প্রত্যেক কাজেই যোগ দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ আমাদের চোখে পড়েছে—আমাদের হঠাৎ চোখ খুলে

গেছে! আমরা স্পষ্ট দেখছি, এ জগৎ তাঁদের নয়, আমাদের। হঠাৎ আমরা ভয়ঙ্কর রকম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি; এই নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হবে!

কেমেরিখ্‌কে দেখতে যাবার আগে আমরা তার জিনিসপত্র বেঁধে নিলুম, দেশে ফেরবার সময় এগুলো তার দরকার লাগবে।

হাসপাতালে বেজায় হুড়োমুড়ি লেগেছে। কার্বলিক ঈথার আর ঘামের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। বাসায় এটা আমাদের অনেকেরই অভ্যাস হয়ে গেছে—কিন্তু এখানে যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমরা কেমেরিখের খোঁজ নিলুম। একটা প্রকাণ্ড ঘরে সে শুয়ে ছিল।

আমরা যেতে সে অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করলে। যখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কে তার ঘড়িটি চুরি করে নিয়েছে।

ম্যুলের ঘাড় নেড়ে বললে—"তোমায় আমি বরাবরই বলতুম, অমন দামী ঘড়িটা সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ো না।"

ম্যুলের একটা অসভ্য হাঁদা। তার উচিত ছিল চুপ করে থাকা। কারণ বেশ বোঝা যায় কেমেরিখের এই শেষ শয্যা। তার ঘড়ি ফিরে পাওয়া যাক না যাক তার পক্ষে একই কথা। বড়ো জোর কেউ তার বাড়িতে ঘড়িটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে পারে।

ক্রোপ্‌ বললে—"কেমন আছ কেমেরিখ্‌?"

কেমেরিখ্‌ মাথাটা নিচু করে বললে—"মন্দ নয়; তবে পায়ে এমন ভীষণ একটা ব্যথা হয়েছে—'

আমরা তার পা-ঢাকা চাদরটার দিকে তাকালুম। তার পা'টা একটা তারের ঢাকার তলায় রাখা ছিল। একটু আগে বাইরে আর্দালি

আমাদের জানিয়েছে যে কেমেরিখের পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেমেরিখ্ এখনও সে কথা জানে না। ম্যুল্যের এই কথাটা 'কেমেরিখ্‌কে বলতে যাচ্ছিল, আমি তার পায়ে এক লাথি মেরে তাকে থামিয়ে দিলুম। কেমেরিখের রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখের উপর যন্ত্রণার রেখা গভীরভাবে দাগ টেনেছে—সেখানে জীবনের যেন কোনও চিহ্ন নেই। ভিতরে ভিতরে মৃত্যু তার কাজ শুরু করেছে তার চোখের মধ্যে স্পষ্ট তার ছাপ পাওয়া যায়। এই কেমেরিখ্‌ই কিছুদিন আগে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে ঘোড়ার মাংস রোস্ট করেছে, শেল্ হোল্‌এর মধ্যে বসে গল্প করেছে। আমাদের সামনেই এখনও সে রয়েছে—কিন্তু সে যেন থেকেও নেই। একটা ঝাপসা পর্দার ভিতর দিয়ে তাকে আমরা দেখছি, তার গলার স্বর শুনছি।

যখন আমরা যুদ্ধের জন্যে যাত্রা করেছিলুম তখনকার কথা মনে পড়ল। কেমেরিখের সঙ্গে তার মা স্টেশন অবধি এসেছিলেন। অনবরত কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখমুখ ফুলে উঠেছিল। তিনি কিছুতেই শান্ত হচ্ছিলেন না বলে কেমেরিখ্ তাঁকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তিনি হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে আমার হাত ধরে বললেন—"তুমি কেমেরিখ্‌কে একটু দেখোশুনো।" সত্যিই, কেমেরিখ দেখতে ছিল শিশুর মতো কোমল! চার সপ্তাহ ধরে সৈনিকের মোট বওয়ার কষ্টে তার ক্ষীণ দেহ যেন ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে কি যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ কারুর তদ্বির করতে পারে, না, দেখাশোনা করতে পারে?

ক্রোপ বললে—"তুমি শিগগিরই দেশে যেতে পাবে। অন্তত তিন চার মাস তো তোমার ছুটি।"

কেমেরিখ্ ঘাড় নাড়লে। ওর রক্তহীন হাতদুটোর দিকে তাকানো যায় না, যেন মোমের মতো শাদা নির্জীব! নখগুলোর মধ্যে ট্রেঞ্চের নীল রঙের মাটি ঢুকে গেছে—যেন বিষ বলে মনে হয়!

ম্যুলের ঝুঁকে পড়ে বললে—"কেমেরিখ্, আমরা তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি।"
কেমেরিখ্ ইঙ্গিত করে বিছানার তলায় রেখে দিতে বললে। তারপর সে আবার সেই ঘড়ির কথা তুললে! ওকে শান্ত করাই মুশকিল।
ম্যুলের একজোড়া বুট জুতো হাতে করে ঘরে ঢুকল। নরম হলদে চামড়ার ইংলিশ বুট। সে তার ময়লা ছেঁড়া জুতোর সঙ্গে ওটাকে দেখলে, তারপর একগাল হেসে বললে—"এই বুট জুতোটা কি তুমি নিয়ে যাবে কেমেরিখ্?"
আমাদের তিনজনের প্রত্যেকেরই মাথায় ঠিক একই কথা এলো। যদি বা সে সেরেও ওঠে, সে একপাটি মাত্র বুট ব্যবহার করতে পারবে, ও জুতোজোড়া ওর কোনোই কাজে লাগবে না। কিন্তু বুটের কথা এখন তোলাই মুশকিল। পাছে কেমেরিখ্ তার পা-কাটা সম্বন্ধে কোনো রকম সন্দেহ করে, তাই জুতোজোড়া তার সামনেই রেখে দিতে হবে। তার মৃত্যু হলেই হাসপাতালের আর্দালিরা হয়তো সেটা গ্রাস করবে।
ম্যুলের বললে—"তুমি কি জুতোটা আমাদের দিয়ে যাবে না?"
কেমেরিখের ইচ্ছে তা নয়—ওটা তার অনেক শখের জিনিস।
ম্যুলের আবার বললে—"বেশ তো বদলা-বদলি করে নেওয়া যেতে পারে। এখানে থাকলে জিনিসটা বরং কাজে লাগবে।" তবুও কেমেরিখ্‌কে নড়ানো গেল না।
ম্যুলের-এর পায়ে জোরে একটা লাথি কষালুম। নিতান্ত অনিচ্ছায় ম্যুলের আস্তে আস্তে বুট জুতো খাটের তলায় রেখে দিলে।
আর কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা বিদায় নিলুম। আমি বলে গেলুম, কাল সকালে আবার আসব। ম্যুলের বললে—সেও আসবে। তার

মাথায় তখনও সেই লেস্‌-বাঁধা জুতোর কথা ঘুরছে—ঠিক সময়টিতে সে হাজির থাকতে চায়।

কেমেরিখের জ্বরভাব হয়েছিল। মাঝে মাঝে সে গোঙিয়ে উঠছিল। যাবার সময় আমরা একজন আর্দালিকে ডেকে বললুম, কেমেরিখ্‌কে এক ডোজ মর্ফিয়া দিতে।

আর্দালি বললে—"সকলকে যদি এক ডোজ করে মর্ফিয়া দিতে হয় তাহলে বালতি বালতি মর্ফিয়া আমদানি করতে হবে।"

ক্রোপ চটে গিয়ে বললে—"তোমরা খালি সর্দারের সেবা করতেই আছ।" আমি তাকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে আর্দালির হাতে একটা সিগারেট দিলুম। সে নিলে। আমি আরো দুটো তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললুম—"একটু দয়া কোরো ভাই—"

সে বললে—"আচ্ছা বেশ।"

ক্রোপ আর্দালিকে বিশ্বাস করতে পারলে না, সে তার পিছনে পিছনে গেল। আমরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ম্যুলের আবার সেই বুট জুতোর কথা তুললে—"আঃ, আমার পায়ে ওটা চমৎকার ফিট করত। আমার নিজের এই জুতোটায় কেবল ফোস্কা পড়ে। আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয় কাল সকালে আমাদের ড্রিল হওয়া পর্যন্ত ও বাঁচবে? যদি রাত্রেই মারা যায় জুতোটা শেষটা বেহাত হয়ে—"

ক্রোপ ফিরে এল। আমরা বাসায় ফিরে চললুম। কাল কেমেরিখের মাকে কি করে লিখব তাই ভাবছি। আমার হাত-পা কন্‌ কন্‌ করছে। একটু 'রম্‌' খেতে পারলে হত।

ম্যুলের একমুঠো ঘাস তুলে দাঁতে করে চিবোতে আরম্ভ করে দিলে।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি। ম্যুলের ক্রোপকে জিগগেস করলে—"কান্টোরেক মাস্টারমশাই তোমায় কি লিখেছেন?"

সে হেসে বললে—"আমরা সব লোহায় পেটা ছোকরা!" আমরা তিনজনেই হেসে উঠলুম। হ্যাঁ, এই হাজার হাজার কাণ্টোরেক এই ভাবেই আমাদের দেখে। লোহায় পেটা ছোকরা! ছোকরা বটে! আমাদের মধ্যে কারো বয়স কুড়ির বেশি নয়। কিন্তু আমরা আর ছোকরা নেই। তারুণ্য যেটুকু আমাদের ছিল সে অনেক কাল হল চলে গেছে। আমরা অকালে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি!
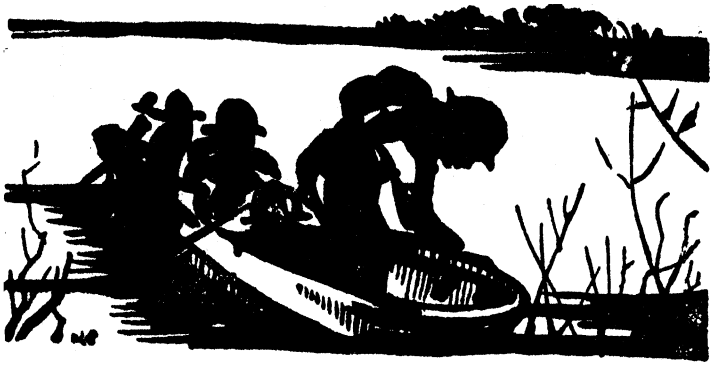
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এখন মনে করলে অবাক হই যে আমার বাড়িতে আমার দেরাজের ভিতর এক গোছা কবিতা আর 'সাউল্' নামে একটা নাটকের আরম্ভটা এখনও পড়ে আছে। কত সন্ধ্যা তাদের নিয়ে আমার কেটে গেছে! আমাদের অনেকেই এই রকম কবিতা লেখে—কিন্তু এখন জিনিসটা এমন অবাস্তব বলে মনে হয় যে ঠিক ধারণাই করতে পারিনে। যেদিন থেকে আমরা এখানে এসেছি সেই দিন থেকেই আমাদের আগেকার দিনগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধ কেটে গেছে। অনেক সময় আমরা অতীতের দিকে তাকিয়ে এর একটা মানে খোঁজবার চেষ্টা করি, কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই খুঁজে পাইনি। কুড়ি বছরের ছোকরা আমরা—ক্রোপ, ম্যুলের, লেএআর এবং আমি, কান্টোরেক যাদের বলেন 'লোহার ভীম'—আমাদের কাছে সমস্ত যেন কেমন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকে! আমাদের বড়োর দল তাঁদের অতীতের জীবনের সঙ্গেই জোড়া আছেন। তাঁদের স্ত্রীপুত্র আছে, কাজ-কারবার আছে—তা এমন পাকা পোক্ত রকমে খাড়া করে এনেছেন যে এই যুদ্ধও তা এক তিল নড়িয়ে দিতে পারেনি। আর আমাদের মতো কুড়ি বছরের ছোকরা—

আমাদের আছে খালি বাপ-মা, হয়তো কারও এক-আধটি প্রেমপাত্রী—যাদের উপর আমাদের সামান্যই টান।

এ ছাড়া যা আছে তা নিতান্তই সামান্য—কিছু উৎসাহ, দু-একটা খেয়াল আর আমাদের ইস্কুল—এর মধ্যেই আমাদের জীবন বদ্ধ। এখানে এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে এই অপরিসর জীবনের কিছুই যেন আর বাকি নেই—সমস্ত ধুয়ে মুছে গেছে!

কাণ্টোরেক হয়তো বলবেন, আমরা সবেমাত্র জীবনযাত্রার চৌকাঠ মাড়িয়েছি। তাই মনে হয় বটে। আমাদের যেন এখনও শিকড় গাড়াই হয়নি। যুদ্ধের স্রোতে আমরা ভেসে গেছি। বয়স্কদের পক্ষে যুদ্ধটা একটা বাধার মতো এসেছে, তাঁরা এর পরপারের কথাও ভাবছেন। আর আমাদের এটা সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে, এর অন্ত কোথায় আমরা জানিনে। আমরা শুধু জানি যে হঠাৎ একটা নিদারুণ রকমের অদ্ভুত কৌশল আমাদের নিষ্ফলা পতিত জমির মতো করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। যাই হোক এসত্ত্বেও আমরা দিনরাত মুখ শুকিয়ে থাকি না।

ম্যুলের যদিও কেমেরিখের বুট পেলে আনন্দিত হবে, কিন্তু তাই বলে কেমেরিখের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সে যে আর সকলের মতোই দুঃখিত নয়—তা নয়। সে শুধু ব্যাপারটাকে পরিষ্কার ভাবে দেখছে। যদি বুটজোড়াটা কেমেরিখের কাজে লাগত, ম্যুলের বরং খালি পায়ে কাঁটা তারের উপর দিয়ে হেঁটে যেত তবু সেটা হস্তগত করবার চেষ্টা করত না। কিন্তু অবস্থা এখন এমন যে জুতোটা পা-কাটা কেমেরিখের তো কোনো কাজেই আসবে না—কেমেরিখও বাঁচবে না; বুটজোড়া যেই পাক তার কিছু আসে যায় না। সুতরাং ম্যুলেরই বা সেটা না পায় কেন? হাসপাতালের আর্দালির চেয়ে তার অধিকার বেশি। কেমেরিখ্

মারা গেলে সুযোগ ফসকে যেতে পারে; তাই মূল্যের এখন থেকেই সজাগ আছে।

আমরা যত কিছু বাজে ভাবনা তা ভাবতে ভুলে গেছি। যা ঘটছে শুধু তাই আমাদের চোখে পড়ে। এবং আমরা জানি রণক্ষেত্রে ভালো এক জোড়া বুট সহজে পাওয়া মুশকিল।

এককালে কিন্তু অন্যরকম ছিল। যখন ডিষ্ট্রীক্ট্ কমাণ্ডাণ্টের কাছে আমরা কুড়িজন কিশোর যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে গেলুম তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই বেশ গর্বের সঙ্গে সেই প্রথম দাড়ি কামিয়ে সেনাবারিকে গিয়েছিল। আমাদের ভবিষ্যতেরও কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। আমাদের জীবন-গতি, আমাদের উপজীবিকা, আমাদের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট কল্পনা করতে পারতুম না! তখনও আমাদের দৃষ্টি এমন অস্পষ্ট ছিল যে জীবনটাকে—এমন কি যুদ্ধটাকেও—একটা আদর্শ-লোক, একটা উপন্যাস-রাজ্যের মতো বোধ হত। সৈন্যদলে আমরা দশ সপ্তাহ তালিম পেয়েছিলুম এবং এইটুকু সময়ের মধ্যে এই শিক্ষার প্রভাব আমাদের উপর এতটা কাজ করেছিল যে ইস্কুলে দশ বছরেও তা হয়নি। আমরা শিখলুম, এতটুকু একটা চকচকে বোতাম চার খণ্ড সোপেনহাওয়ারের (বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক) বইয়ের চেয়েও বেশি মূল্যবান। প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে, তারপর বিরক্ত হয়ে এবং শেষে উদাসীন ভাবে মেনে নিলুম যে 'মন' না থাকলেও চলে, কিন্তু বুট বুরুশ না হলে চলা মুশকিল; বুদ্ধির চেয়ে বাঁধা নিয়ম এবং স্বাধীনতার চেয়ে ড্রিল শিক্ষার বেশি প্রয়োজন। আমরা সৈনিক হয়েছিলুম আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু ওরা ঐ উৎসাহ এবং আগ্রহ জিনিসটাকেই আমাদের মধ্যে থেকে দূর করে দেবার জন্যে করতে আর কিছু বাকি রাখলে না। তিন সপ্তাহ বাদে

আমরা বেশ ভালো করে বুঝলুম যে একজন সাধারণ ডাকহরকরা আমাদের উপর যতটা কর্তৃত্ব ফলাবে, আমাদের পিতা-মাতা এবং শিক্ষকরাও তা এ পর্যন্ত পারেননি। আমাদের গুরুমশায়ের কাছ থেকে শেখা জন্মভূমির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা কোথায় তলিয়ে গেল। আমাদের নতুন ফোটা চোখে আমরা দেখলুম জন্মভূমিকে ভালোবেসে আমরা নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়েছি, যা হীনতম দাসকেও দিতে হয় না।

—সেলাম করা, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ানো, কুচকাওয়াজ, ডাইনে ঘোরা, বামে ঘোরা, দু' গোড়ালি এক করা, তদুপরি অপমান এবং আরও হাজারো রকমের খুঁটিনাটি। আমরা ভেবেছিলুম আমাদের কাজ হবে অন্য এক রকম; কিন্তু দেখলুম সার্কাসের ঘোড়ার মতো করে আমাদের বীরত্ব শিখতে হবে। অথচ এতেও শীঘ্রই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়লুম।

আমাদের ক্লাসের ছেলেরা তিন-জন চার-জন করে এক একটা পল্টনে ভাগ হয়ে গেল; এই পল্টনের মধ্যে মেছো চাষা থেকে মুটে মজুর সকলের সঙ্গেই আমরা বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিলুম। ক্রোপ, ম্যূলের, কেমেরিখ্ আর আমি কর্পোরাল হিমেলস্টোশের অধীনে ৯নং পল্টনে চলে গেলুম। ক্যাম্পের মধ্যে এঁর খুব কড়া কায়দাকানুন-দোরস্ত বলে খ্যাতি ছিল। এবং তার জন্যে ইনি গর্বও অনুভব করতেন। বেঁটে খাটো মানুষ মোম দিয়ে ছুঁচোল করে পাকানো গোঁফ; বারো বৎসর চাকরি করছেন এবং যুদ্ধে যোগ দেবার আগে ইনি ডাক-পেয়াদার কাজ করতেন। ক্রোপ, ইয়াডেন, ভেস্টুস্ এবং আমি—এই চারজনের উপর ইনি বিশেষ নারাজ ছিলেন; কারণ আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করতুম না।

একদিন সকালে আমি চোদ্দ বার তাঁর বিছানা করে দিয়েছি।

প্রত্যেক বারই তিনি কিছু না কিছু খুঁৎ বার করে টান মেরে বিছানা ফেলে দিয়েছিলেন। লোহার মতো শক্ত এক জোড়া জুতোকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা দলাই মলাই করে মাখনের মতো নরম করে দিয়েছি। তাঁর হুকুমে আমি দাঁত-মাজা বুরুশ দিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়েছি। বারিকে একবার তুষার-পাত হওয়ায় আমাকে আর ক্রোপকে সেই বরফ ঝাঁট দিতে দেওয়া হয়েছিল এবং যদি ভাগ্যক্রমে একজন লেফটেনেণ্ট ঘটনাস্থলে এসে না পড়তেন তো আমরা বরফে জমে যাবার আগে নিষ্কৃতি পেতুম না। তিনি এসে হিমেলস্টোশকে আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে আমাদের ছুটি দিলেন। তাতে লাভ হল এই যে হিমেলস্টোশ আমাদের উপর আরও চটে গেলেন। উপরি-উপরি ছয় সপ্তাহের প্রতি রবিবার আমি চৌকিদার এবং আর্দালির কাজ করেছি। পিঠে বোঝা, কাঁধে রাইফেল্ নিয়ে আমাকে চষা ভিজে ক্ষেতের উপর কুচকাওয়াজ অভ্যাস করতে হয়েছে। 'তৈয়ার', 'বাড়ো' এবং 'শুযে পড়ো' এই সব হুকুম বার বার তামিল করতে করতে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে কাদার ঢেলা হয়ে অবশ দেহে ছুটি পেযেছি। এবং ঠিক চার ঘণ্টা পরে কাপড় চোপড় পরিষ্কার করে সাফ সুত্‌রো হয়ে ছাল ওঠা রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আমাকে হিমেলস্টোশের কাছে হাজিরা দিতে হয়েছে। ক্রোপ, ভেস্ট্‌স ও ইয়াডেনের সঙ্গে আমাকে তুষারের মধ্যে দস্তানা-শূন্য খালি হাতে বন্দুকের লোহার নল মুঠো করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

একদিন রবিবারে আমি আর ক্রোপ বারিকের উঠানে একটা ময়লার বালতি সাফ করছি, এমন সময় সেজেগুজে ফিটফাট হযে হিমেলস্টোশ সেখানে এসে হাজির। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—"কাজটা কেমন লাগছে?" আমরা আর থাকতে না পেরে বালতির ময়লা তাঁর পায়ের উপর ছুঁড়ে দিলুম। তিনি লাফিযে পিছিযে গেলেন কিন্তু তার আগেই সব একাকার হয়ে গেছে!

তিনি গর্জন করে উঠলেন—"এর ফল হাত-কড়া মনে রেখো !"
ক্রোপ বললে—"আগে তো একটা তদন্ত হবে, তারপর আমরা যা বলবার বলব।"
হিমেলস্টোশ বলে উঠলেন—"বলবে আবার কি? নন্-কমিশন্ড অফিসারের সঙ্গে কেমন করে কথা কইছ মনে রেখো। তোমাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি? দেখাচ্ছি দাঁড়াও।" বলে তিনি গজরাতে গজরাতে চলে গেলেন।
যত রকম মাজাঘষার কাজ আছে সবই আমাদের উপর এসে পড়ল, তার জন্যে কখনও কখনও আমরা রাগে গুম্‌রে উঠতুম। আমাদের কেউ কেউ এর ফলে অসুখে পড়ল। ভোল্‌ফ্‌ তো ফুস্‌ফুসের বিমারিতে মরেই গেল।
ক্রমে ক্রমে আমরা কঠোর, সন্দিগ্ধ, নির্মম, দুষ্টস্বভাবের হয়ে উঠলুম। তা আমাদের পক্ষে ভালোই হল। কারণ এসব গুণ আমাদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। এই শিক্ষাটুকু না নিয়েই যদি আমরা ট্রেঞ্চে যেতুম, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষেপে যেত। এমনি করে এই কঠোরতার মধ্যে দিয়ে আমাদের কপালে যা আছে তার জন্যে আমরা তৈরি হয়ে নিলুম। আসল কথা হচ্ছে, এই শিক্ষার মধ্যে থেকে আমাদের মনে একটা খুব বড়ো ভাব জেগেছিল, যুদ্ধের যা শ্রেষ্ঠ দান, যুদ্ধক্ষেত্রে তাই আমরা পেলুম। আমরা পেলুম সৈন্যে সৈন্যে অন্তরঙ্গভাব—কম্‌রেডশিপ !

কেমেরিখের বিছানার পাশে আমি বসে আছি। ক্রমান্বয়ে সে মৃত্যুর পথেই এগিয়ে চলেছে। আমাদের চারদিকে খুব গোলমাল। একটা আহতদের ট্রেন সবেমাত্র এসে পৌঁচেছে; যে আহতদের সরানো

যেতে পারে তাদের বাছাই করা হচ্ছে। ডাক্তার মশাই কেমেরিথকে লক্ষ্য না করেই তার পাশ দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন।

কেমেরিথ্ বালিশের উপর কনুইএ ভর দিয়ে একটু উঠে বললে—"এরা আমার পা-খানা বাদ দিয়েছে।"

তাহলে কেমেরিথ্ জেনেছে দেখছি। আমি বললুম—"একটা পা কেটেছে, আর একটা আছে তো; তোমার তো তবু ভালো, ভেগেলেরের যে ডান হাতটাই বাদ গেল। তা ছাড়া তুমি শিগগির বাড়ি ফিরে যাবে।"

সে আমার দিকে চেয়ে বললে—"তোমার সত্যিই কি মনে হয় আমি বাড়ি ফিরব ?"

—"নিশ্চয়ই।"

সে আবার বললে—"সত্যি মনে হয় ?"

—"হ্যাঁ ফ্রান্টস্, এই অস্ত্রচিকিৎসা থেকে সামলে উঠলেই তোমার ছুটি।"

সে আমায় নিচু হতে ইশারা করলে। আমি তার উপর ঝুঁকে পড়লুম; সে বললে—"আমার ফেরবার আশা নেই।"

—"কি বাজে কথা বলছ ফ্রান্টস্ ? দুদিন পরে তুমি নিজেই দেখতে পাবে। তা ছাড়া একখানা পা-কাটা এমন আর কি ব্যাপার ? এখানে ওরা এর চেয়ে ঢের খারাপ ঘা জোড়াতাড়া দিয়ে খাড়া করে।"

সে একটা শীর্ণ হাত তুলে বললে—"দেখছ আমার আঙুলগুলোর অবস্থা ?"

—"ও অস্ত্রচিকিৎসার পরে সবারই অমন হয়। পেট ভরে খাও দাও—দেখতে দেখতে সেরে উঠবে। এরা তোমায় ভালো করে দেখা-শোনা করে তো ?"

সে টেবিলের উপর একটা ডিশ দেখিয়ে দিলে, তার আধখানা তখনও খাবারে ভর্তি রয়েছে। কেমেরিথ্ কিছু খায়নি দেখে আমি উত্তেজিত

হয়ে বললুম—"ফ্রান্টস্ তোমার খাওয়া চাই। খাওয়াই এখন দরকার। তা ছাড়া খাবার জিনিসগুলো দেখছি তো বেশ ভালোই দিচ্ছে।"

সে পাশ ফিরল। একটু পরে আস্তে আস্তে বললে—"এক সময় আমার আশা ছিল বড়ো হয়ে আমি বনরক্ষক হব।"

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম—"তা তুমি এখনও হতে পারবে। আজকাল খুব সুন্দর নকল হাত-পা তৈরি হচ্ছে। তুমি বুঝতেই পারবে না যে তোমার অঙ্গ নেই। মাংসপেশীর উপর তাদের জুড়ে দেওয়া হয়। হাতের যে নকল আঙুল বেরিয়েছে তা নাড়ানো যায়, এমন কি লেখাও চলে। তা ছাড়া দিন দিন আরও নতুন নতুন উন্নতি হবে।"

কিছুক্ষণ সে চুপ করে শুয়ে থাকে। তারপর বলে—"ম্যুলের-এর জন্যে আমার লেস্ দেওয়া বুটটা তুমি নিয়ে যেতে পারো।"

আমি ভেবে পাইনে, কি বলে তাকে উৎসাহ দেব। তার ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, হাঁ বড়ো হয়ে গেছে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ বসে গেছে, চামড়ার তলায় রক্ত নেই, দেহ কঙ্কালসার হয়ে আসছে, আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে মরতে একেই যে আমি প্রথম দেখছি তা নয়, কিন্তু আমরা ছেলেবেলা থেকে একই সঙ্গে মানুষ হয়েছি—তাই যা কিছু!

অন্ধকার হয়ে আসে। কেমেরিখের মুখের রঙ বদলে যায়। বালিশ থেকে সে মাথা তোলে—ধীরে ধীরে তার ঠোঁট নড়ে ওঠে। আমি তার কাছে সরে আসি। সে ফিস্ ফিস্ করে বলে—"যদি আমার ঘড়িটা খুঁজে পাও, বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো।"

আমি জবাব দিই না। কথা বলেও কোনো লাভ নেই। ওকে আর কোনো মতেই সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না। দুর্ভাগা আমি অসহায়!

হাসপাতালের আর্দালিরা গামলা আর বোতল নিয়ে আনাগোনা করছে। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে কেমেরিখকে একবার

দেখে চলে গেল। স্পষ্ট বুঝলুম, অপেক্ষা করছে—কেমেরিখের বিছানাটা সে চায়।

আমি ক্রান্ট্সের উপর ঝুঁকে পড়ে বললুম—"সম্ভবত তোমায় ক্লোস্টেরবের্গের রুগ্নাবাসে নিয়ে যাবে। সেখানে তুমি আস্তে আস্তে সেরে উঠবে। তখন তুমি জানালা দিয়ে দেখতে পাবে মাঠের পারে দুটি গাছ। এখন হচ্ছে বছরের সবচেয়ে সুন্দর সময়, ফসলে পাক ধরেছে, সন্ধ্যার সময় রোদ পড়ে মাঠগুলোকে মনে হবে যেন নানারঙের ঝিনুক মোড়া হয়ে গেছে, আর দেখতে পাবে সেই ক্লোস্টেরবাখের সরু গলি—দুধারে পপ্লারের সার—সেই যেখানে আমরা মাছ ধরতুম। তুমি চাও তো একটা কাঁচের টবে মাছ পুষতে পারবে, তুমি নিজের ইচ্ছের বেড়াতেও যেতে পারবে, ইচ্ছে হয় তো পিয়ানোও বাজাতে পারবে।"

তার অন্ধকার-লেপা মুখের দিকে আমি ঝুঁকে পড়ি। ও কখনও ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলছে। চোখের জলে দু'গাল ভিজে গেছে, কাঁদছে। আঃ, বোকার মতো যা তা বকে দেখো আমি কি কাণ্ড বাধিয়ে বসলুম!

আমি হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে তার মুখের উপর মুখ রেখে বলি—"ফ্রান্ট্স্, তুমি এখন ঘুমোও না কেন?"

সে কোনও জবাব দিলে না। গাল বেয়ে তার টস্ টস্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার ইচ্ছে হয় চোখের জল মুছিয়ে দি কিন্তু আমার রুমালটা যা নোংরা!

এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা কেটে যায়। আমি স্থির হয়ে বসে তার প্রত্যেকটি নড়াচড়া দেখি, যদি সে কখনও কিছু বলে। একবার মনে ভাবি মানুষটা যদি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে? কিন্তু সে এক কাতে শুয়ে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে। সে তার মা'র কথা, ভাই বোনের কথা, কারও কথাই বলে না। কোনও কথাই বলে না।

সব ছেড়ে এখন সে কেবল নিজের একটুখানি উনিশ বছরের জীবনটি নিয়ে রয়েছে। এই ক্ষুদ্র জীবনটি তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাই তার কান্না!

কেমেরিথ হঠাৎ গোঙানি শুরু করলে।

আমি লাফিয়ে উঠে বাইরে গিয়ে ডাকতে লাগলুম—"ডাক্তার কোথায়? ডাক্তার কোথায়?"

একটা শাদা আলখাল্লা দেখবামাত্র আমি পাকড়াও করে বললুম—"শিগগির আসুন। ফ্রান্টস্ কেমেরিথ মারা যাচ্ছে।"

তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনের আর্দালিকে জিগগেস করলেন—"কোন জন?"

সে বললে—"২৬ নং বিছানা। পা কাটা হয়েছে।"

তিনি নাক সিঁটকে বললেন—"আজ তো পাঁচটা পা কেটেছি, কি করে জানব কোনটা?" আমায় সরিয়ে দিয়ে তিনি আর্দালিকে বলে গেলেন—"তুমি গিয়ে দেখ।" বলেই অস্ত্রচিকিৎসার ঘরের দিকে দৌড় দিলেন।

রাগে আমার গা কাঁপতে থাকে। আর্দালির সঙ্গে আমিও চললুম। সে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—"ডাক্তারবাবু কি করবেন? সেই ভোর পাঁচটা থেকে একটার পর একটা অস্ত্র করতে হচ্ছে। আজকে কটা মরেছে জানেন? ষোলোটা; আপনারটা সতেরো নম্বরের; সবশুদ্ধ হয়তো কুড়িতে গিয়ে ঠেকবে।"

আমার মনে হল যেন আমি মূর্ছা যাচ্ছি। কিছুই করবার আমার শক্তি নেই। হয়তো এখনই আমি পড়ে যাব, আর কখনও উঠতে পারব না। কেমেরিথের বিছানার পাশে এসে আমরা দাঁড়ালুম। তখন সে মারা গেছে। চোখের জলে মুখখানা তখনও ভিজে। আধখোলা চোখে সে পড়ে আছে।

আর্দালি আমায় একটু ঠেলা দিয়ে বললে—"এর জিনিসপত্র কে নিয়ে যাবে, আপনি ?" আমি ঘাড় নাড়ি।

সে বলে চলে—"আমরা এখনই একে সরিয়ে ফেলব। বিছানার আমাদের ভারি দরকার। বাইরে রোগীরা অনেকে মাটিতে শুয়ে রয়েছে।"

আমি জিনিসপত্র একত্র করে কেমেরিখের 'আইডেন্‌টিফিকেশন ডিস্‌ক্'টা খুলে নিলুম।

ঘরের বাইরে এসে অন্ধকারে এবং খোলা বাতাসে মনে হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। যত পারি প্রাণ ভরে আমি নিশ্বাস নিই। চোখে মুখে মৃদু গরম বাতাসের স্পর্শ পাই। হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে ফুলবাগানের কথা, শাদা মেঘের কথা জেগে ওঠে। বুটের মধ্যে পা সজোরে চলতে থাকে। আমি দ্রুত চলতে চলতে তারপর দৌড়তে থাকি। আমার পাশ দিয়ে সৈন্যরা চলে যায়, তাদের কথা আমার কানে ভেসে আসে কিন্তু কিছু বুঝিনে……

মূল্যের কুটিরের সামনে আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে বুটজোড়া দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি। সে পায়ে দিয়ে দেখে বেশ ফিট করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন রংরুটের দল এসে পৌঁচেছে। খালি জায়গা সমস্ত ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরোনো, কিন্তু পঁচিশ জন যা আছে তারা একেবারে আনকোরা—আমাদের চেয়ে তারা প্রায় দুবছরের ছোটো। ক্রোপ আমায় ধাক্কা দিয়ে বলে—"খোকাদের দেখেছ?" আমি ঘাড় নাড়ি। তাদের সামনে আমরা বুক ফুলিয়ে চলি; খোলা জায়গায় আমরা দাড়ি কামাই; পকেটে হাত দিয়ে নতুন রংরুটদের দিকে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি, আমরা হচ্ছি ঘাগী লড়িয়ে! কাট্‌সিন্‌স্কি আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। নতুন সৈন্যদের গ্যাসের মুখোস আর কফি জোগানো হয়েছে। একজন বাচ্চার কাছে গিয়ে কাট্ বলে—"বহুদিন তোমরা ভালো কিছু খেতে পাওনি—না?" সে মুখভঙ্গী করে বলে—"সকালে শালগমের রুটি, দুপুরবেলা শালগমের সুরুয়া, রাত্রে শালগমের কাটলেট আর শালগম সিদ্ধ—এই?"—"শালগমের রুটি। তবে তো তোমাদের ভাগ্য ভালো; এখানে করাতের গুঁড়ো দিয়ে রুটি তৈরি হয় তা জানো না বুঝি! কিন্তু মটরশুটি কেমন লাগে? চাই কিছু?" ছেলেটি বলে ওঠে—"আর ঠাট্টা করতে হবে না।"

কাট্‌সিন্সকি বলে—"খাবার বর্তনটা আনো তো দেখি।"
আমরা কৌতূহলী হয়ে কাটের সঙ্গে চলি। সে তার খড়ের বিছানার পিছনে একটা গামলার কাছে আমাদের নিয়ে যায়। তার প্রায় অর্ধেকটা গোস্ত আর মটরশুটির ঝোলে ভরা। কাট্‌সিন্সিকি তার সামনে সেনানায়কের মতো দাঁড়িয়ে হুকুম দেয়—"নজর সাফ রাখো, আর তাড়াতাড়ি হাত চালাও।"
আমরা অবাক হয়ে যাই। আমি বলি—"কোথা থেকে সংগ্রহ হল, কাট্‌?"
কাট্‌ বলে—"হাইনরিথ্‌কে তিন টুকরো প্যারাশুটের সিল্ক দিয়ে তার বদলে এগুলো পেয়েছি। সে খুশি হয়েই বদল করেছে। বাসি মটরশুটি খেতে খুব ভালো, না?"
অনিচ্ছার সঙ্গে সে ছোটোদের কিছু অংশ দিয়ে বলে—"এবার থেকে যখন খাবার বাটি নিয়ে আসবে, অপর হাতে একটা চুরুট বা দোক্তা নিয়ে এসো, বুঝলে?" তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলে—"তোমাদের কথা অবশ্য আলাদা—তোমরা দায়ে খালাস।"

কাট্‌সিন্সকি কখনও অভাবে পড়ে না—তার মধ্যে একটা অতিশক্তি আছে। কাট্‌সিন্সকি জাতে মুচি, তবে মুচিগিরির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে সব ব্যবসাই ভালো বোঝে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে লাভ আছে। মনে কর, রাত্রিবেলা আমরা এক সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় এসে উঠলুম। হয়তো একটা অন্ধকার কারখানা বাড়ি। ঘরের মধ্যে ঝোলা বিছানা। বিছানা হচ্ছে, একজোড়া লম্বা কাঠের গায়ে তারের জাল লাগানো। তারের বিছানা বড়ো কড়া। বিছানায় পাতবো এমনও কিছু নেই। আমাদের বর্ষাতিগুলো বড়ো পাতলা।

কাটু চারিদিকে দেখে নিয়ে ভেস্টুস্কে বললে—"এসো আমার সঙ্গে।" বলে তারা. খুঁজতে বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টা বাদে তারা খড়ের বোঝা নিয়ে ফিরে এল। কোথা থেকে কাটু যে খড় আবিষ্কার করে আনলে তা জানিনে। যাই হোক এখন আরাম করে ঘুমুতে পারা যাবে। কিন্তু যে প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে!

একজন গোলন্দাজ সৈনিক কিছুদিন ধরে সেখানে ছিল। ক্রোপ্ তাকে জিগগেস করলে—"এদিকে কোনো সরাইখানা-টানা নেই?"

সে হেসে বললে—"সরাই? এদিকে কিছুই নেই। একটি কুঁড়েও পাওয়া যাবে না।"

—"তাহলে এখানে কোনো বাসিন্দাই নেই নাকি?"

সে বললে—"দুজন আছে। তবে তারা প্রায় সারাদিনই রান্নাঘরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে বেড়ায়।"

তবেই তো মুশকিল হল। খাবার আসতে তো সেই সকাল। যতক্ষণ তা না আসে কোমরবন্ধটাকে পেটের উপর কষে বেঁধে বসে থাকতে হবে।

কিন্তু আমি দেখলুম কাটু মাথায় টুপি পরছে। বললুম—"কোথায় চললে, কাটু?"

—"দেখি, যদি কিছু খুঁজেপেতে আনতে পারি, একটু ঘুরে আসি।"

বলে সে বেরিয়ে গেল।

গোলান্দাজ বিদ্রূপ করে বললে—"কত ঘুরবে ঘুরে আসুক। আপনারা খুব একটা আশা করে বসে থাকবেন না।"

হতাশ হয়ে আমরা শুয়ে পড়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকি।

ক্রোপ্ একটা সিগরেট ভেঙে আধখানা আমাকে দেয়। ইয়াডেন মটরশুটি আর শুয়োরের মাংসের গল্প জুড়ে দেয়। সে বলে, মেতির

গন্ধ না থাকলে তার খাওয়াই হয় না। আর রাঁধতে যদি হয় তো আলাদা আলাদা না রেঁধে আলু, মটরশুটি আর মাংস সব একসঙ্গে হাঁড়িতে চড়ানো উচিত। কে একজন গর্জে ওঠে, ইয়াডেন যদি চুপ না করে তো তাকে মেতিপাতার মতো থেঁৎলে দেবে। তারপর প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল দুটি বোতলের মুখে দুটি মোমবাতি মিটমিট করে জ্বলতে থাকে আর থেকে থেকে সেই গোলান্দাজের থুথু ফেলার শব্দ কানে আসে।

দরজা খুলে কাট্ প্রবেশ করতেই আমরা একটু নড়ে উঠি। আমার মনে হয় যেন আমি স্বপ্ন দেখছি। তার বগলে দুটো পাঁউরুটি আর রক্ত মাখানো একটা চটের থলে—তার মধ্যে ঘোড়ার মাংস।

গোলান্দাজের মুখ থেকে পাইপটা খসে পড়ে যায়। সে পাঁউরুটিটা ছুঁয়ে বলে—"বাবা, এ সে সত্যিকারের রুটি; এখনও গরম রয়েছে—"

কাট্ বুঝিয়ে কিছুই বলে না। সে রুটি পেয়ে গেছে—বাস্, বাকিটাতে কি আসে যায়! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি তাকে মরুভূমির মধ্যেও ছেড়ে দেওয়া যায়, আধঘণ্টার মধ্যে সে ভরপেট খাবার মতো মাংসের রোস্ট্, খেজুর আর মদ যোগাড় করে আনবে।

সে ভেস্ট্ সকে সংক্ষেপে হুকুম দেয়—"কাঠ কেটে আনো।"

তারপর তার কোটের পকেট থেকে সে একটা লোহার তাওয়া, পকেট থেকে কিছু নুন, আর খানিকটা চর্বি বার করে! কিছুই সে ভোলেনি। মেঝেতে সে খানিকটা আগুন করে, তাতে শূন্য কারখানা-ঘরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি।

গোলান্দাজ বেচারা একটু ইতস্তত করে। সে ভাবে কাট্‌কে খোসামোদ করলে সেও একটু ভাগ পাবে কি না। কিন্তু কাট্‌সিন্সকি তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সে শাপান্ত করতে করতে চলে যায়।

কাট্ মাংস রান্না করে, কিন্তু আমরা চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে বসে পেট ভরিয়ে নি।

এই হচ্ছে কাট্। কোনও খাদ্যদ্রব্য কোনও বিশেষ জায়গায় হয়তো একঘণ্টার মতো পড়ে আছে, দেরি করলে আর থাকবে না, কাট্ ঠিক তা জানতে পারে। সে টুপিটা মাথায় দিয়ে সেই বিশেষ ঘণ্টার মধ্যে সেই বিশেষ জায়গা থেকে সেই বিশেষ খাদ্যদ্রব্যটা সংগ্রহ করে আনবেই। সে সব জিনিস খুঁজে বার করে। স্টোভ, কাঠ, খড়, ঘাস, টেবিল, চেয়ার—সবচেয়ে বেশি বার করে খাবার। মনে হয় যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে নিয়ে আসছে!

এই সৈনিক জীবনের একটা দিন আমরা একসঙ্গে এমন চমৎকার ভাবে কাটিয়েছিলুম যা এখনও ভুলতে পারিনি। সেটা ছিল ফ্রন্টে যাবার ঠিক আগের দিন। একটা নতুন-গড়া সেনাদলের মধ্যে আমাদের ভর্তি করা হয়েছিল। পরের দিন ভোরবেলা আমাদের ছাড়বার কথা। সন্ধ্যার সময় আমরা হিমেলস্টোশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলুম।

হিমেলস্টোশের শিক্ষার প্রণালীর জন্যে তার উপর ইয়াডেনের বড়ো রাগ। ইয়াডেন বেচারা রাত্রে ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব করে ফেলত। হিমেল্স্টোশ বলত ওটা ওর কুড়েমি। তার জন্যে সে ইয়াডেনের রোগ সারাবার এক ফন্দি বার করলে।

খুঁজে খুঁজে সে দলের মধ্যে থেকে কিণ্ডেরফাটের নামে আর একজন লোককে আবিষ্কার করলে—তারও ঐ এক রোগ। তাকে ইয়াডেনের সঙ্গে একসঙ্গে রাখবার বন্দোবস্ত হল। সেনাবারিকের মধ্যে সাধারণত ঝোলানো বিছানার ব্যবস্থা। হিমেল্স্টোশ এদের একজনকে দিলে

নিচের বিছানা আর একজনকে ঠিক তার উপরে। নিচে যে থাকত তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার পরদিন নিচের জনকে উপরে, উপরের জনকে নিচে দেওয়া হত—যাতে দুজনেই দুজনের উপর শোধ নিতে পারে। এই ছিল হিমেল্স্টোশের আত্মশিক্ষার নিয়ম।

মৎলবটা হীন হলেও বেশ পাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনোই ফল পাওয়া গেল না। কারণ উভয়ের মধ্যে যে রোগটা ছিল সেটা কুড়েমি নয়, সত্যিকারের রোগ—তাদের ফ্যাকাশে রঙ দেখলেই সেটা বোঝা যেত। শেষ পর্যন্ত তাদের একজনকে সারারাত মেঝেতে শুয়ে কাটাতে হত; তার ফলে প্রায়ই তার সর্দি হত।

ক্রোপ্ প্রস্তাব করেছিল যে যুদ্ধের অবসানে হিমেল্স্টোশ যখন আবার ডাক-হরকরা হয়ে যাবে সে হিমেল্স্টোশের উপরে চাকরি নেবে। তখন কেমন ভাবে তার উপর সে শোধ নেবে এই ভেবে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত। আমরা সকলেই ভাবতুম শান্তির সময় এর সমস্ত শোধ তুলব। শুধু এই প্রতিশোধের আশাতেই আমরা তার শাসনের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাইনি।

তবে সে হচ্ছে সেই সুদূর ভবিষ্যতের কথা। তার আগেই তাকে বেশ এক-ঘা দেবার জন্যে আমরা একটা মতলব আঁটলুম। যদি সে আমাদের চিনে ফেলতে না পারে, আর কাল ভোরেই যদি আমরা চলে যাই, সে আমাদের কি করতে পারে?

প্রতিদিন বিকেলবেলা কোথায় সে মদ খেতে যেত তা আমাদের জানা ছিল। গোরাবারিকে ফিরে এসে তাকে একটা নির্জন অন্ধকার পথ দিয়ে যেতে হত। সেইখানে একটা পাথরের ঢিপির আড়ালে লুকিয়ে তার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার সঙ্গে একটা বিছানা-ঢাকা চাদর ছিল। যদি সে একা আসে তবেই নিশ্চিন্ত। উৎকণ্ঠায় আমাদের গা কাঁপতে থাকল। অবশেষে তার পায়ের শব্দ

শোনা গেল ; পরিচিত শব্দ। প্রতিদিন বিছানার তপ্ত আবরণের মধ্যে থেকে এই শব্দ শুনি।

ক্রোপ্ ফিস্‌ফিস্ করে বললে—"একলা আছে ?"

—"হ্যাঁ, একলা।"

ইয়াডেন আর আমি টিপির পাশ থেকে নিঃসাড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

গান গাইতে গাইতে হিমেল্‌স্টোশ আসছে, বেশ ফুর্তি! কোমরবন্ধের বকলসটা চক্‌চক্ করছে। সে কিছুমাত্র সন্দেহ না করে এসে পড়ল।

আমরা বিছানার চাদরটা নিয়ে পিছন থেকে এক লাফ দিয়ে তার মাথা থেকে পা শুদ্ধ ঢেকে একটা থলি বানিয়ে ফেললুম। তার আর হাত পা তোলবারও যো রইল না। ফুর্তির গানটা থেমে গেল। পরমুহূর্তে হাইএ ভেস্টুস্ ভারি খুশি হয়ে তার বাহু বিস্তৃত করে এসে দাঁড়াল। তারপর বেশ করে দাঁড়িয়ে নিয়ে তাক করে সেই শাদা থলির উপর এমন এক প্রচণ্ড ঘুষি বসালে যে তাতে বুনো মোষ ঘুরে পড়ে যায়!

হিমেল্‌স্টোশ গড়াতে গড়াতে চীৎকার করতে লাগল। কিন্তু আমরা তার জন্যে তৈরি ছিলুম এবং একটা গদি সঙ্গে এনেছিলুম। ভেস্টুস্ বেশ করে পা গুটিয়ে বসল। হাঁটুর উপর গদিটাকে রেখে সে হাৎড়ে খুঁজে হিমেল্‌স্টোশের মাথাটা হাতে নিলে। তারপর ঝুঁটি ধরে গদির উপর তার মুখ ঠেসে ধরলে। তৎক্ষণাৎ তার চীৎকার বন্ধ হয়ে গেল। থেকে থেকে তাকে একটু করে নিশ্বাস নেবার অবসর দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে ষাঁড়ের মতো চীৎকার করে ওঠে ; ভেস্টুস্ আবার ঠেসে ধরে তাকে চুপ করিয়ে দেয়।

ইয়াডেন দেখি মুখে একটা চাবুক নিয়ে হিমেল্‌স্টোশের কোমরবন্ধ খুলে ট্রাউজারটা নামিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে সপাং সপাং শুরু করে দিলে।

চমৎকার দৃশ্য! হিমেল্‌স্টোশ মাটিতে পড়ে ; ভেস্টুস্ তার উপর

রক্তপিপাসুর মতো ঝুঁকে ; তার মাথা ভেস্টুসের হাঁটুর উপর ; ইয়াডেন অক্লান্ত কাঠুরের মতো হাত চালিয়ে যাচ্ছে। ইয়াডেনকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে তবে আমরা আমাদের পেটাবার পালা পাই।

শেষে ভেস্টুস হিমেল্স্টোশকে ধরে দাঁড় করিয়ে শেষবারের মতো প্রচণ্ড আর এক ঘা বসালে। টলতে টলতে হিমেল্স্টোশ হুমড়ি খেয়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ল।

আমরা যত জোরে পারি ছুট দিলুম। ভেস্টুস একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"প্রতিশোধ হচ্ছে গরমাগরম মালপোয়া, বাবা!"

হিমেল্স্টোশের এতে খুশি হওয়াই উচিত। কারণ তার নীতিতে বলে—আমরা পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষিত করব—এতদিনে সেই শিক্ষার ফল ফলল।

হিমেল্স্টোশ কাউকেই ধরতে পারেনি। যাই হোক তার একটা বিছানার চাদর লাভ হয়েছিল, কারণ কয়েক ঘণ্টা পরে সেটা খুঁজতে এসে আমরা পাইনি।

সেদিনকার সন্ধ্যার ঘটনায় প্রাণটা খুব খুশি হল—পরদিন সকাল বেলার যাত্রার গ্লানি সব দূর হয়ে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফ্রন্ট্ লাইনে তার খাটানোর কাজের জন্যে আমাদের যেতে হবে। অন্ধকার হতে মোটর লরি এসে উপস্থিত হল। আমরা উঠে পড়লুম। সন্ধ্যার আকাশ যেন প্রকাণ্ড একখানি চমৎকার চাঁদোয়ার মতো বিস্তৃত—যার নিচে একজনের জন্যে আর একজনের মন টানতে থাকে। ভা-রি মনোরম! কঞ্জুষ ইয়াডেনটা পর্যন্ত আমায় একটা সিগারেট দান করে ফেললে। গায়ে গায়ে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি—বসবার জায়গা নেই—তার আশাও আমরা করিনে। ম্যুলের আজ নতুন বুটজোড়া পরে বেশ আয়েশে আছে। লরির ইঞ্জিন ঘড়্ ঘড়্ করে ওঠে। একটা ঝাঁকানি দিয়ে লরিটা লাফিয়ে উঠে গড়্ গড়্ করে চলতে থাকে। উঁচু নিচু গর্তে ভরা রাস্তা। আমরা একটি আলোও জ্বালাইনি, তার জন্যে আমরা থেকে থেকে কাৎ হয়ে গাড়ি শুদ্ধ উল্টে পড়বার মতো হচ্ছি। গাড়ি যে কোনো সময়েই উল্টে যেতে পারে। কিন্তু তার জন্যে আমাদের বিশেষ চিন্তা নেই। আমরা জানি রণক্ষেত্রে গুলি লেগে পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাওয়ার চেয়ে গাড়ি থেকে পড়ে একটা হাত ভেঙে যাওয়া অনেক

ভালো আর অনেকে তাতে বরং খুশিই হবে; কারণ তাতে বাড়ি ফিরে যাবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়।

আমাদের পাশে পাশে লম্বা সারি বেঁধে যুদ্ধের সম্ভার চলেছে। আমাদের চেয়ে তারা কিছু এগিয়ে চলেছে। আমরা চেঁচিয়ে তাদের সঙ্গে তামাশা করছি, তারা জবাব দিচ্ছে।

রাস্তার ধারে একখানা বাড়ির পাঁচিল দেখা গেল। আমি হঠাৎ কান খাড়া করলুম। আমি কি ভুল শুনছি? আবার শুনতে পেলুম, হাঁস প্যাক্ প্যাক্ করে ডাকছে। কাট্‌সিন্‌স্কির দিকে একবার তাকালুম; সেও আমার দিকে চাইলে; দুজনেই দুজনের মনের ভাব বুঝলুম।

—"শুনলে কাট্?"

কাট্ জিভ কচলে বললে—"নম্বরটা টুকে নিয়েছি। যখন ফিরে আসব দেখা যাবে।"

গোলন্দাজদের আর্টিলারি লাইনে আমাদের লরি এসে পৌঁছল। পাছে আকাশ থেকে দেখা যায় তাই ঝোপঝাড়ের আড়ালে কামান-গুলোকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যদি এখানে কামান লুকোনো না থাকত এই গাছ-পাতাগুলোকে দেখাত প্রফুল্ল, সুন্দর, নবীন!

কামানের ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় বাতাসটা কটু হয়ে উঠেছে। বারুদের গন্ধে মুখ পর্যন্ত বিস্বাদ লাগছে। কামানের গর্জনে আমাদের লরি টলমল করছে। চারিদিকের সমস্তই যেন থরথর করে কাঁপছে। আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের মুখের ভাব বদলে যায়। আমরা অবশ্য একেবারে সম্মুখশ্রেণীতে এসে পৌঁছইনি, রিজার্ভসএর দলে আছি, তবু প্রত্যেকের মুখে যেন লেখা হয়ে গেছে—এরই নাম ফ্রন্ট্! ফ্রন্টের বেষ্টনের মধ্যে আমরা রয়েছি!

ঠিক ভয় নয়। আমরা যতবার গেছি এসেছি তাতে করে আমাদের পায়ের চামড়া শক্ত হয়ে গেছে। কেবল নতুন রংরুটরা উত্তেজিত

হয়ে উঠেছে। কাট্ তাদের বুঝোতে থাকে—"ওটা একটা ১২-ইঞ্চি কামান—আগে গোলা ফাটার আওয়াজ, তারপর কামানের শব্দ!"

গোলা ফাটার শব্দ শুনি, কিন্তু কামান ছোঁড়ার ফাঁকা শব্দ আমাদের কানে আসে না—ফ্রন্টের মিলিত কোলাহলে তা মিলিয়ে যায়। কাট্ শুনে বলে—"আজ একটা গোলাবর্ষণ হবে। আমার মজ্জার মধ্যে আমি তার সাড়া পাচ্ছি।"

আমাদের পাশে তিনটে গোলা এসে পড়ল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আগুনের হল্‌কাটা যেন ছুটে বেরিয়ে এল; গোলার টুকরোগুলো শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস চিরে চলে গেল! আমরা শিউরে উঠে ভাবি যে তবু ভালো কাল সকালেই আমরা কুটিরে ফিরে যাব।

সাধারণত যেমন থাকে, আমাদের চেহারা যে তার চেয়ে ফ্যাকাশে কি তার চেয়ে রাঙা হয়ে উঠেছে এমন নয়; মুখ যে শুকিয়ে গেছে কি শিথিল হয়ে পড়েছে তাও নয়—তবু কেমন ধারা যেন বদলে গেছে। বোধহয় আমাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে কিসের একটা ঝিলিক্ চলে গেছে। এ শুধু শব্দের অলঙ্কার নয়; সত্যিই তাই—একটা ঝিলিক্! এরই নাম ফ্রন্ট, ফ্রন্টের এই চেতনাই সেই ঝিলিক্। যে মুহূর্তে প্রথম গোলাটা মাথার উপর দিয়ে বাতাসে শিটি দিয়ে ছুটে চলে যায় সেই মুহূর্তে আমাদের শিরায়, অঙ্গে, চোখে একটা ক্ষিপ্রতা জেগে ওঠে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। চোখের নিমিষে সারা দেহ একেবারে প্রস্তুত হয়ে যায়।

প্রত্যেক বারেই এই একরকম হয়। ফ্রন্টের জন্যে যখন যাত্রা করি, তখন আমরা সাধারণ সৈন্য—হয় উৎফুল্ল, নয় বিষণ্ণ। তারপর প্রথম কামানের সঙ্গে পরিচয়—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথার সুরে পর্যন্ত একটা নতুন রেশ পড়ে।

কাট্ যখন সেনাবারিকের কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—"আজ

একটা গোলাবর্ষণ হবে," তখন সেটা তার একটা মত মাত্র। কিন্তু ঐ কথাটাই যখন এইখানে এই ফ্রণ্টে দাঁড়িয়ে বলে তখন চকচকে সঙ্গিনের মতো সেটা ধারালো হয়ে ওঠে, চিন্তার মধ্যে অবাধে ঢুকে যায়! যেন একটা গূঢ় অর্থ—"আজ একটা গোলাবর্ষণ হবে।" আমাদের অন্তরের নিভৃততম স্থান পর্যন্ত কেঁপে উঠে সতর্ক হয়ে দাঁড়ায়।

আমার কাছে ফ্রণ্ট্ যেন একটা ঘূর্ণীজল। যদিও বহুদূরে স্থির জলের মধ্যে আমি রয়েছি তবুও ধীরে ধীরে আওড়ের টান আমাকে কেন্দ্রের কাছে টেনে নিয়ে চলেছে—এর থেকে আর নিস্তার নেই।

মাটি থেকে, বাতাস থেকে আমাদের ভরণ-পোষণ হচ্ছে—সব চেয়ে বেশি হচ্ছে মাটি থেকে। মাটির টান একজন সৈন্যের কাছে যতটা আর কারও কাছে তত নয়। যখন সে মাটির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, যখন গোলার আগুনে মৃত্যুর ভয়ে সে তার মুখ হাত পা মাটির মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করে তখন মাটিই তার একমাত্র বন্ধু ভাই মা সব! মাটির স্তব্ধতার মধ্যে সে তার ভয়, তার কান্না নির্বাসিত করে। মাটি তাকে আশ্রয় দেয়, দশ সেকেণ্ডের জন্যে জীবন দান করে। তারপর আবার তাকে কোলে টেনে নেয় হয়তো চিরকালের জন্যে!

মাটি! মাটি! মাটি!

আতঙ্কের হাত থেকে, ধ্বংসলীলার হাত থেকে, মৃত্যুর কোলাহলের মধ্যে থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষ তোমার খাঁজ, তোমার ফাটল, তোমার গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয় নেয়।

প্রথম গোলার শব্দেই আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত চেতনা জাগে। যেন হাজার হাজার বছর আগেকার সেই পশু-স্বভাব! এই পশু-সুলভ

সংস্কারই আমাদের চালিত করে এবং তারই বলে আমরা বেঁচে যাই! এটা যে ঠিক চেতনা তাও নয়—তার চেয়েও অনেক ক্ষিপ্র, অনেক নিশ্চিত এবং অভ্রান্ত! জিনিসটা বুঝিয়ে বলা যায় না। হয়তো আমাদের একজন কোনোদিকে দৃক্‌পাত কর্ণপাত না করে হেঁটে যাচ্ছে—হঠাৎ সে জমির উপর সটান শুয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের উপর দিয়ে ভীষণ বেগে এক ঝাঁক গোলার টুক্‌রো নিরাপদে বেরিয়ে চলে গেল! তবু সে কিছুতেই মনে করতে পারবে না যে সে গোলাটা আসার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, অথবা মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এ কথা তার মাথায় এসেছিল। অথচ ঐ অজ্ঞাত পাশবিক চেতনায় যদি সে না চালিত হত তার দেহ এতক্ষণে হয়ে যেত একতাল মাংসপিণ্ড! এই তৃতীয় চক্ষু, এই অতি-অনুভূতিই আমাদের অগোচরে আমাদের রক্ষা করে। এ না থাকলে ফ্ল্যান্‌ডার্‌স্‌ থেকে ভস্‌জেস্‌-এর মধ্যে একজন লোকও বেঁচে থাকত না।

তাই বলছিলুম, আমরা যখন কুচকাওয়াজ করে চলি তখন আমরা হয় বিষণ্ণ, নয় প্রফুল্ল। তারপর যে মুহূর্তে ফ্রণ্টের সীমারেখার মধ্যে এসে পৌঁছই, সেই মুহূর্তে আমরা হয়ে পড়ি এক-একটি নর-পশু!

একটা ছন্নছড়া রকমের বনের মধ্যে গিয়ে আমরা প্রবেশ করি। এইখানে আমাদের রান্নাঘর—সেটা পেরিয়ে গিয়ে বনের আড়ালে আমরা নেমে পড়ি। লরি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভোরের আগেই এইখানে এসে আমাদের আবার তুলে নিয়ে যাবে।

মাঠের উপর বুকের সমান উঁচু কুয়াশা আর কামানের ধোঁয়া। আকাশে চাঁদ। রাস্তার উপর সৈন্যের দল সারি বেঁধে দাঁড়ায়। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় তাদের লোহার টোপগুলো চক্‌চক্‌ করে। শাদা কুয়াশার

উপরিভাগে কেবল সারি সারি মাথা, সারি সারি বন্দুক বেরিয়ে আছে দেখতে পাই।

তোপ, গোলাগুলি ইত্যাদি তোড়জোড় বয়ে মালগাড়িগুলো চৌমাথা হয়ে সারি সারি চলেছে। গাড়ির ঘোড়ার পিঠগুলো চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে; তাদের গতি বড়ো সুন্দর! কামানের গাড়িগুলো জ্যোৎস্না-মাখা ঝাপসা দিগন্তের কোলের উপর দিয়ে একটানা ভাবে চলেছে। ইস্পাতের টোপ-পরা ঘোড়সওয়ারদের দেখে মনে হয় যেন অতীত যুগের যোদ্ধা—ছবিখানা আশ্চর্য সুন্দর ও বিস্ময়কর!

আমরা আমাদের ডেরাতে এগিয়ে চললুম। আমাদের কেউ কেউ কাঁধের উপর ছুঁচোলো পাক-দেওয়া লোহার শিক তুলে নেয়; অন্যেরা চক্‌চকে লোহার ডাণ্ডাগুলো কাঁটাতারের জটগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে চলে। বোঝাগুলো বড়ো ভারি, বড়ো খাপছাড়া!

জমি ক্রমেই উঁচু-নিচু হতে থাকে। সামনে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়—"সামাল—বাঁ হাতে ডোবা—" "সাবধান, খন্দক এড়িয়ে—"

হঠাৎ আমাদের দল দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি টাল খেয়ে সামনে যে কাঁটাতারের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার উপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ি।

দেখি সামনেই রাস্তা জুড়ে কয়েকটা গোলার ঘায়ে চুরমার লরি পড়ে আছে। আবার হুকুম আসে—"সব সিগারেট আর পাইপ নিভিয়ে ফেল!" আমরা প্রায় আগদলে এসে পড়েছি।

ইতিমধ্যে ঘোরতর অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমরা একটা ছোট্ট বন ঘুরে একেবারে আগদলের সামনে এসে পড়লুম।

দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা অনির্দিষ্ট রক্ত-আভা—সে আলো কেবলই চলাচল করছে, মাঝে মাঝে কেবল কামানের মুখ থেকে এক এক ঝলক্ আগুন। থেকে থেকে এক-একটা রূপোলি

কি সোনালি আগুনের গোলা আকাশের গায়ে ঠিক্‌রে উঠেই দুম্‌ করে ফেটে গিয়ে আকাশ ভরে লাল, সবুজ, শাদা তারাবাজি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফরাসিদের এক-একটা হাউই আকাশের উপর সিল্কের প্যারাসুট খুলে দিচ্ছে, তাতে এক-একটা রাতি—দিনের আলোর মতো চারিদিকের সব কিছু সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের গাযে সেই আলো এসে পড়ে; আমরা দেখি আমাদের ছাযা কালো হযে মাঠের উপর পড়ছে। একটা আলো নিভতেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আশমান-গোলা আকাশে ছুটে ওঠে; আবার নীল তারা, লাল তারা, আর সবুজ তারা।

কাটু বলে ওঠে—"আজ নির্ঘাৎ গোলাবর্ষণ!"

সব ক'টা কামানের শব্দ একত্র হযে সব শুদ্ধ মিলে একটা প্রচণ্ড গর্জনের মতো শোনায়—তারপর পরে পরে এক একটা গোলা-ফাটার আলাদা আলাদা শব্দ। মেশিন গানের খটা খটু খটু খটু শব্দ কানে আসে। বড়ো বড়ো গোলার ঘোর গর্জনে আর ছোটো ছোটো গোলার চড়চড়ানিতে উপরের বাতাস কেঁপে ওঠে।

অন্ধকার আকাশ ঝাঁটিযে দিযে সার্চ-লাইটের আলো এধার-ওধার ফিরে বেড়ায়—সারি সারি লম্বা লম্বা আলোর ডাঁটি। তাদের মধ্যে একটা খানিকক্ষণ থম্‌কে দাঁড়ায, তারপর কাঁপতে থাকে। পরের মুহূর্তে তার পাশে আর একটা আলোর ডাঁটি এসে উপস্থিত হয়। তাদের দুটোর মধ্যে ধরা পড়েছে একটা উড়োজাহাজ—যেন একটা কালো ভুকুৎ পোকা—প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছে। আলোয় সেটার চোখে ধাঁধা লেগে যায; তারপর ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ে!

ফাঁক ফাঁক করে আমরা লোহার খুঁটি পুঁতে চলি। দুজন লোক একটা তারের কুণ্ডলী ঝুলিয়ে ধরে, অপর সকলে তার টেনে চলে। কাঁটা তার খোলা আমার অভ্যাস নেই বলে আমার হাত ছড়ে যায়।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু লরি আসতে অনেক দেরি। আমাদের অনেকেই মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমিও চেষ্টা করি কিন্তু এত শীত যে ঘুম আসতে চায় না।

থাকতে থাকতে এক সময় আমি বেহুঁস ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে বুঝতে পারলুম না আমি কোথায় আছি। আকাশের গায়ে দেখি হাউই উঠছে, রঙিন তারাবাজি ঝরছে, মুহূর্তের জন্যে মনে হয় যেন কোনো উৎসবের কুঞ্জে ফুল-বাগানের ঘাসের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছি। সকাল কি সন্ধ্যা ঠিক বুঝতে পারিনে। যেন প্রদোষের পাণ্ডুর আলোর ঝুলনায় শুয়ে আছি—কান পেতে যেন শুনতে চাচ্ছি কারো মৃদু গুঞ্জন—আমি কাঁদছি নাকি? চোখে হাত দিয়ে দেখি! অপরূপ স্বপ্নের মতো লাগে, মনে হয় যেন আমি এখনও শৈশব পার হইনি। কেবল একটি মুহূর্তের মতো এই ছবিটুকু থাকে; তারপরই কাট্‌সিন্সকির ছায়ামূর্তি আমার চোখে পড়ে। রণ-প্রবীণ কাট্‌ বসে বসে নিঃশব্দে ঢাকনি-বন্ধ পাইপ টানছে। আমাকে জাগতে দেখে সে বললে—"চমকালে নাকি? ও কিছু নয়—ব্যস্ত হবার দরকার নেই, ঐ ঝোপটার উপরে গিয়ে পড়েছে!"

আমি উঠে বসি, মনে হয় যেন নিতান্ত একলা পড়ে গেছি। কাট্‌ যে এখানে আছে তবু ভালো। সে ফ্রন্টের দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বলে—"চমৎকার আতসবাজি। কেবল যদি এত বিপজ্জনক না হত।" আমাদের ঠিক পিছনে এসে একটা গোলা পড়ে। দুজন সৈনিক ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। দু' মিনিট বাদে আরও কাছে একটা আসে।

তারপর রীতিমতো গোলাবর্ষণ শুরু হয়। যতটা পারা যায় হুমড়ি খেয়ে আমরা পড়ে থাকি। এর পরেরটা প্রায় আমাদের দলের মাঝে এসে পড়ে। আকাশের প্রান্তে সবুজ তারার হাউই উঠতে থাকে। বারাজ শুরু হয়। মাটি ছিটকে উপরে ওঠে, গোলার টুকরো শন্ শন্ করে ছুটতে থাকে।

আমাদের পাশে একজন সৈনিক ভয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে। সে দু'হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে, তার মাথা থেকে টোপ খুলে পড়ে। আমি সেটা তুলে তার মাথায় পরিয়ে দিলুম। সে মুখ তুলে একবার চাইলে, শিরস্ত্রাণটাকে খুলে ফেলে দিয়ে শিশুর মতো আমার বাহুর তলায় গুঁড়ি মেরে এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ল! আমি আপত্তি করলুম না। তার টোপটাকে নিতান্ত পড়ে থাকতে না দিয়ে তার পাছার উপর সেটা রাখলুম—তামাশা করে নয়, কাজে লাগাবারই জন্তে; কারণ ঐ জায়গাটাই তখন তার শরীরের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু অংশ।

একটা গোলার টুকরো এসে কাকে যেন জখম করেছে। গোলা ফাটার শব্দের ফাঁকে ফাঁকে তার চীৎকারের শব্দ পাচ্ছি।

অবশেষে গোলাবর্ষণ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে গোলা এখন রিজার্ভস্‌দের উপর পড়ছে। সাহস করে একবার উঁকি মেরে দেখি। লাল তারার হাউই উঠতে আরম্ভ করেছে —খুব সম্ভবত একটা আক্রমণ আসবে।

আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে এখনও কোনো গোলযোগ নেই। আমি সেই রংরুটকে ঝাঁকানি দিয়ে বলি, "ওঠো খোকা, সব চুকে গেছে।" সে হতভম্ব হয়ে চারিদিকে তাকায়। আমি বলি—"দেখতে দেখতে তোমার এ অভ্যাস হয়ে যাবে।"

সে তার টোপটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পরে। অল্প অল্প করে সে

প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর হঠাৎ সে মুখ রাঙা করে বোকার মতো তাকাতে থাকে। আস্তে আস্তে তার হাতটা পিছনে নিয়ে গিয়ে আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়।

আমি তখনই বুঝি যে কামানের শব্দে অসামাল হয়ে গেছে। আমি তাকে বলি—"তার জন্যে আর লজ্জা কি! প্রথম গোলাবর্ষণের সঙ্গে পরিচয়ের সময় অনেকেরই অমন হয়ে থাকে। ঐ ঝোপটার পাশে গিয়ে যাও তোমার ভিতরের জাঙিয়াটা ছেড়ে এসো।"

সে আড়ালে চলে যায়। যুদ্ধের কোলাহল শান্ত হয়ে আসে; কিন্তু একটা ভীষণ আর্তনাদ আর থামে না। আমি বলি—"ব্যাপারটা কি, ক্রোপ্?"

সে বলে—"ব্যাপার হচ্ছে ওদিককার দু'সার ফৌজ সাবাড় হয়ে গেছে।"

চীৎকার থামে না। মানুষ নয় নিশ্চয়, কারণ মানুষ এত ভীষণ চীৎকার করতে পারে না।

কাট্ বলে—"ঘোড়া জখম হয়েছে।"

অসহ্য। আমাদের মুখ শাদা হয়ে যায়। ডেটেরিং দাঁড়িয়ে উঠে বলে—"ঈশ্বরের দোহাই! গুলি করে ওদের মেরে ফেলা হোক।" সে জাতে চাষা সুতরাং সে ঘোড়ার দরদ বোঝে।

হঠাৎ যেন ইচ্ছা করেই গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। মরণাপন্ন জন্তুগুলোর চীৎকার আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। চাঁদের রূপোলি আলোতে নিষুপ্ত মাঠঘাটের কোন অংশ থেকে সে চীৎকার আসছে বুঝতে পারা যায় না; এই পৈশাচিক চীৎকার যেন অদৃশ্য লোক থেকে এসে স্বর্গ মর্ত্য চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। ডেটেরিং চেঁচিয়ে ওঠে—"গুলি করে মেরে ফেলো! মেরে ফেলো!"

ক্যাট্‌ ধীরে ধীরে বলে—"আগে ওরা মানুষদের খেদমত করবে তবে তো ঘোড়া!"

আমরা দাঁড়িয়ে উঠে কোন দিক থেকে শব্দ আসছে দেখবার চেষ্টা করি। যদি জানোয়ার ক'টাকে চোখেও দেখতে পেতুম তো অনেকটা সহ্য করা যেত। ম্যুলেরের দূরবীনটা দিয়ে আমরা দেখতে পাই একদল কালোপানা কারা আহতদের তুলে নেবার জন্যে স্ট্রেচার নিয়ে ঘুরছে। আর এখানে ওখানে উঁচু উঁচু কতকগুলো আরও গাঢ় ছায়ামূর্তি—তারাও ঘুরছে ফিরছে—এইগুলোই আহত ঘোড়া—অবশ্য সবগুলো নয়। কোনোটা লাফাতে লাফাতে কিছু দূরে গিয়ে পড়ে যায়, আবার উঠে ছুটতে থাকে। একটার পেট ফেটে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। সেই নাড়ীভুঁড়িগুলো পায়ে জড়িয়ে সে পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়ায়।

ডেটেরিং তার বন্দুক তুলে তাগ্‌ করতে থাকে। কাট্‌ তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বন্দুকটা উপর দিকে তুলে দিয়ে বলে—"ক্ষেপেছ নাকি?"

ডেটেরিং কাঁপতে কাঁপতে তার রাইফেল মাটিতে ফেলে দেয়।

আমরা বসে পড়ে আমাদের কান চেপে ধরি। কিন্তু এই বিকট চীৎকার আর গোঙানি যেন সবদিক জুড়ে নিয়েছে! কিছুতে তাকে ঠেকানো যায় না!

আমরা প্রায় সব কিছুই সহ্য করতে পারি; কিন্তু এই শব্দে আমাদের গা ঘেমে উঠতে থাকে। মনে হয় উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাই এত দূরে—যেখানে এই চীৎকার এসে পৌঁছতে পারে না। তবু এ তো শুধু ঘোড়া, মানুষ নয়।

অন্ধকারের মধ্যে গুলির শব্দ কানে আসে। ঘোড়াগুলোকে গুলি করে মারছে! এতক্ষণে বাঁচলুম। কিন্তু যন্ত্রণার চোটে ঘোড়াগুলো এত দৌড়চ্ছে যে মানুষ তাদের নাগালই পাচ্ছে না। একজন হাঁটু গেড়ে তাগ্‌ করে একটা গুলি ছুঁড়ল—একটা ঘোড়া পড়ল—তারপর

আর একটা। শেষেরটা সামনের পা দুটোর উপর ভর করে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল—বেচারার শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। সৈন্যরা ছুটে গিয়ে আবার গুলি করলে। আস্তে আস্তে সে মাটিতে কাত হয়ে পড়ল।

আমরা কান পেতে হাত তুলে নিই। গোলার শীশী ধ্বনি, হাউই আর তারা—তিনে মিলে একটি চমৎকার রূপ ধরে।

ডেটেরিং উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে—"যুদ্ধের কাজে বেচারা ঘোড়া-গুলোকে লাগানোর চেয়ে নীচ কাজ আর কিছু হতে পারে না।"

আমরা ফিরে যাই। লরিতে ফেরবার সময় হয়েছে। আকাশটা একটু পরিস্কার হয়েছে। ভোর তিনটে।

সার বেঁধে গড়খাই গাড়ার মধ্যে দিয়ে সেই আগেকার কুয়াশার রাজ্যে এসে পড়ি। কাট্‌সিন্সিকি কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে, লক্ষণটা ভালো নয়।

ক্রোপ্‌ বলে—"কি হয়েছে কাট্‌?"

কাট্ গম্ভীর মুখে বলে—"ভালোয় ভালোয় বাসায় যেতে পারলে বাঁচি।"

—"এখনই পৌঁছে যাব কাট্‌, বেশি আর দেরি কি?"

কাট্ যেন একটু ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়; কেবলই বলতে থাকে—"কি জানি ভাই, বলা যায় না।"

আমরা ট্রেঞ্চের অলিগলির মধ্যে দিয়ে খোলা মাঠে এসে পড়ি ছোট্ট বনটা আবার চোখে পড়ে। এখানকার প্রত্যেকটি ঢেলার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ওরই কাছে একটা গোরস্থানও আছে।

চলেছি এমন সময় আমাদের পিছন থেকে বজ্রপাতের মতো শব্দ জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সটান শুয়ে পড়ি। আমাদের সামনে প্রায় একশো গজ দূরে প্রকাণ্ড একটা আগুনের হলকা মাটি থেকে লাফিয়ে ওঠে।

পরমুহূর্তে দ্বিতীয় আর একটা গোলা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে দেখি জঙ্গলটার এক অংশ আস্তে আস্তে শূন্যে উঠল—তিন চারটে গাছ শূন্যভরে এটার-ওটার ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে গেল! ইঞ্জিনের সিটির মতো শব্দ করে গোলা ছুটে চলে—ভীষণ গোলাবর্ষণ!

কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—"আড়ালে যাও, আড়ালে যাও!" মাঠটা সমতল, বন এখনও বহু দূরে, তা ছাড়া বিপজ্জনক—একমাত্র আড়াল পাওয়া যেতে পারে গোরস্থানের স্তূপগুলো। আমরা অন্ধকারের মধ্যে হুড়মুড় করে প্রত্যেকে যেন কোন যাদুমন্ত্রে এক একটি কবরের আড়ালে গা ঢাকা দিই। গোলাফাটার আগুনের হল্‌কায় গোরস্থান আলোকিত হয়ে ওঠে!

কোনো দিকে পালাবার উপায় নেই। এই অগ্নিবর্ষণের আলোয় আমি মাঠটা দেখে নেবার চেষ্টা করি। সমস্ত মাঠটাকে মনে হয় যেন একটা উত্তাল সমুদ্রের মতো, তার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা লক্‌লক্ করে ওঠে। এর মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। সারা বনটা টুকরো টুকরো ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। এই গোরস্থানের মধ্যেই আমাদের এখন পড়ে থাকতে হবে।

ঠিক সামনে খানিকটা জমি ফেটে চারিদিকে ইট পাটকেল ঢেলা ছিটিয়ে দেয়। আমি একটা চাবুকের মতো আঘাত পাই। দেখি আমার আস্তিনটা একটা গোলার কুচিতে ছিঁড়ে গেছে। আমার আঙুলগুলো মুঠো করে দেখি—নাঃ, কোনো বেদনা নেই। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারিনে, কারণ কিছুক্ষণ সময় না গেলে ক্ষতের যন্ত্রণা বোঝা যায় না। সারা হাতটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখি—এক জায়গায় একটু ছড়ে গেছে মাত্র। আমার মাথায় আর একটা চোট এসে লাগায় আমি চৈতন্য হারাতে শুরু করি। চকিতের মতো আমার মস্তিষ্কে এই চিন্তা আসে—"অজ্ঞান হয়োনা—অজ্ঞান হয়োনা—"

আর একটা গোলার টুক্‌রো আমার টোপটায় এসে লাগল। কিন্তু অনেক দূর থেকে আসায় লোহার পাতকে ফুটো করতে পারলে না। চোখ থেকে কাদা মুছে দেখি ঠিক আমার সামনেই একটা প্রকাণ্ড ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। যে জায়গায় একবার গোলা পড়ে সাধারণত সেখানে দ্বিতীয়বার আর গোলা পড়ে না। আমি এক লাফে সেই গর্তের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে মাছের মতো নেতিয়ে পড়ে থাকি। আর একটা সিটির শব্দ পাই! আমি তাড়াতাড়ি গুড়ি মেরে নিজেকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করি। হঠাৎ দেখি বাঁ-দিকে একটা কি! তার গাযে ঘেঁষে যেতেই সেটা ভেঙে পড়ে। আমার চোখের সামনে মাটি লাফিয়ে ওঠে। শব্দে কানে তালা লেগে যায়। আমি সেই ভাঙা বস্তুটার তলায় গুড়ি মেরে ঢুকে তাই দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখি। একটা পচা কাঠের তক্তা —চারিদিকে শন্ শন্ করে গুলির টুক্‌রো ছুটেছে, তার মধ্যে একটা খেলো বর্ম!

কার একটা জামার হাতায় আঙুল ঠেকে; এ কি, একটা হাত যে! আহত মানুষ নাকি? আমি তাকে চেঁচিয়ে ডাকি—কোনো উত্তর নেই—মরে গেছে দেখছি। আরও হাৎড়াই—ছোটো ছোটো চেলা কাঠ। তখন মনে পড়ে যে আমরা গোরস্থানের মধ্যে রয়েছি। এই কাঠগুলো ভাঙাচুরো কফিনের কাঠ।

গোলাবৃষ্টি ক্রমেই ভীষণতর হয়ে ওঠে। আমি সেই কফিনের মধ্যে আরও নিবিষ্ট হয়ে পড়ে থাকি। এ-ই এখন আমার আশ্রয়।

আমার সামনে মাটির গর্তটা হাঁ হযে যায! এক লাফে ওর মধ্যে চলে যাই। মুখের উপর একটা চাপড় খাই। আমার কাঁধের উপর কার একটা থাবা এসে পড়ে—মরা মানুষটা জেগে উঠল নাকি? আমার হাতটা ধরে কে ঝাঁকিয়ে দেয়! মাথাটা ঘুরিয়ে নিতেই এক ঝলক্ আলোয় চোখে পড়ে, কাট্‌সিন্সকির মুখ। সে হাঁ করে চীৎকার করছে।

চারিদিকের কোলাহলে আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি নে। সে আমার কানের কাঁছে মুখ নিয়ে আসে। কোলাহলের একটু ফাঁকে আমি শুনতে পাই—"গ্যাস, গ্যা-অ্যা-স, গ্যা-অ্যা-অ্যা-স—মুখ ঢাকা দাও।"
বড়ো বড়ো গোলাবাজির মধ্যে গ্যাসের গোলার ঢ্যাবঢেবে শব্দ কানে আসছে। গোলাবাজির ফাঁকে ফাঁকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি এসে সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছে—গ্যাস—গ্যা-অ্যাস!
আমার পিছনে একজন কে লাফিয়ে এল, তারপর আর একজন। গরম নিশ্বাসের ভাপে আমার মুখোসের কাঁচটা ঝাপসা হয়ে গেছে। কাঁচটা মুছে ভালো করে দেখি কাট্, ক্রোপ্ আর একজন কে। আমরা কয়জনে সেইখানে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকি।
গ্যাসের মুখোস পরবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যায়। মুখোসটার বেশ ঠাস বুনন তো? কোথাও ছেঁদা নেই? হাসপাতালে যে ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি তা আমার মনে পড়ে। বিষাক্ত গ্যাসের রোগীরা সারা দিনরাত ধরে হাঁপাচ্ছে, তাদের কাশির সঙ্গে জ্বলে-যাওয়া ফুসফুসের কুঁচি উঠে আসছে।
অতি সাবধানে ভ্যাল্‌ভে মুখ রেখে আমি নিশ্বাস নিই। এখনও মাটির উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড থলথলে জেলি মাছের মতো গড়াতে গড়াতে বিষাক্ত গ্যাস এসে খানা খন্দে জমা হচ্ছে। বাতাসের চেয়ে ভারি বলে নিচু জায়গায় সব চেয়ে বেশি গ্যাস জমা হয়। কাট্‌কে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে আমি বলি, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে উপরে শোয়াই ভালো। কিন্তু তার আগে দ্বিতীয়বার গোলাবৃষ্টি শুরু হয়। এবার আর যেন গোলা ফাটছে বলে মনে হয় না—এ যেন মাটির তলা থেকে গর্জন আসছে।
একটা কালো রঙের কি পদার্থ হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। দেখি একটা কফিন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে।

মনে হল কাট্ কোথায় যাচ্ছে, আমিও চললুম। আমাদের গর্তের মধ্যে যে চতুর্থ সৈনিকটি ছিল তার একটা হাতের উপর এসে কফিনটা চেপে পড়েছে। যন্ত্রণার চোটে সে অন্য হাত দিয়ে তার মুখোসটা ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ক্রোপ্ ঠিক সময় তাকে ধরে তার হাত মুচড়ে দেয়।

তার চেপ্টে যাওয়া হাতটাকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে আমি আর কাট্ যাই। কফিনের ঢাক্‌নাটা খুলে গিয়েছিল, আমরা তার মধ্যে থেকে মৃতদেহটা বার করে টেনে ফেলে দি, তারপর তার তলার দিকটা আলগা করবার চেষ্টা করি।

সৌভাগ্যক্রমে লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ক্রোপও তখন আমাদের সাহায্যে আসে। তিনজনে মিলে বাক্সটা সরিয়ে তাকে মুক্ত করি।

অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। কাট্ এক টুকরো কাঠ নিয়ে ভাঙা হাতটার তলায় রাখে, আমরা আমাদের সব ক'টা ব্যাণ্ডেজ তার হাতে জড়িয়ে দি। এখনকার মতো এর বেশি আমরা কিছুই করতে পারিনে।

মুখোসের মধ্যে আমার মাথা ভন্ ভন্ করছে, বুক যেন চেপে আসছে, বার বার ব্যবহার করা সেই একই নিশ্বাস নিচ্ছি, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়।

আমি গর্তের বাইরে উঠে পড়লুম। অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম কার একখানা পা সাফ ছিঁড়ে এসে পড়ে রয়েছে। পায়ের বুটটা বেশ গোটাই রয়েছে। এক পলকের মধ্যে সবটা দেখে ফেললুম। একটু দূরে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ব্যস্ত হয়ে কাঁচটা মুছে ফেললুম—সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝাপসা হয়ে গেল; তার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলুম, লোকটার মুখে মুখোস নেই।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে দেখলুম, সে ঘুরে পড়ে গেল না;

সে ফিরে তাকিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল। আমিও এক টানে আমার মুখোস খুলে ফেললুম। উত্তপ্ত চোখ-মুখের উপর ঠাণ্ডা জলের মতো বাতাসের ঠাণ্ডা ঢেউ আমাকে অভিভূত করে দিলে।

গোলাবৃষ্টি থেমে গেছে। আমি গর্তের মুখে গিয়ে আর সকলকে খবর দিলুম। তারা তাদের মুখোস খুলে ফেললে। আমরা আহত লোকটাকে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চললুম।

গোরস্থানটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। চারিদিকে মড়া আর কফিনের ছড়াছড়ি। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—একবার যারা মরেছিল তারা গোলার ঘায় আবার আজ মরল। কিন্তু প্রত্যেকটি মৃতদেহ যারা কবরের ঢাকা ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে তারা আমাদের এক একটি জীবন্ত মানুষকে বাঁচিয়ে গেল।

ছিটে বেড়াটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ছোটো ছোটো রেলের লাইনগুলো ভেঙে বেঁকেচুরে আকাশের দিকে খাড়া হয়ে রয়েছে। কে একজন মাটিতে শুয়ে আছে দেখলুম। আমরা দাঁড়ালুম। ক্রোপ একাই আহত লোকটিকে নিয়ে চলল।

যে মাটিতে পড়ে ছিল সে একজন রংরুট। তার পা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এত অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে আমি আমার জলের বোতলে যেটুকু রম্ আর চা ছিল তাই দিতে গেলুম। কাট্ আমার হাত ধরে বারণ করে তার উপর ঝুঁকে পড়ল।

—"কোথায় লেগেছে, কমরেড ?"

সে এত দুর্বল যে জবাব দিতে পারলে না।

আমরা সাবধানে তার পাজামা কেটে ফেলি। সে গোঙিয়ে ওঠে—
"আস্তে আস্তে—"

—যদি তার পেটে গুলি লেগে থাকে তো তার পক্ষে কিছুই খাওয়া উচিত নয়। তবে বমি নেই—এটা একটা ভালো লক্ষণ। পা-টা খুলে দেখি হাড়ে মাংসে আর গোলার কুঁচিতে তাল পাকিয়ে গেছে। গাঁটের মুখে আঘাত লেগেছে—এ বেচারা জীবনে আর হাঁটতে পারবে না।

আমি তার কপালে ভিজে হাত বুলিয়ে দিয়ে এক ঢোক জল খেতে দি। দেখতে পাই তার ডান হাতখানা দিয়েও রক্ত পড়ছে।

কাট্ দুটো তুলোর পোঁটলা চওড়া করে বিছিয়ে ক্ষতটা ঢাকলে। বাঁধবার মতো একটা কিছুর জন্যে আমি এদিকে ওদিকে তাকাই। আমাদের কাছে আর ব্যাণ্ডেজ কিছুই নেই। কাজেই আমি তার ট্রাউজার খুলে তার ভিতরের জাঙিয়া থেকে এক টুকরা কাপড় ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু তার জাঙিয়াই দেখতে পেলুম না। মনে পড়ল, এই সেই ছেলেটি, যাকে কিছুক্ষণ আগে পাঠিয়েছিলুম ঝোপের আড়ালে কাপড় ছাড়তে।

ইতিমধ্যে একজন মৃত সৈনিকের পকেট থেকে কাট্ একটা ব্যাণ্ডেজ বার করে নিয়েছে।

আমি ছেলেটিকে বলি—"আমরা এবার একটা স্ট্রেচার আনতে যাচ্ছি।"

সে ধীরে ধীরে বলে—"এইখানে থাক।"

কাট্ বললে—"আমরা এখনি ফিরে আসছি। কেবল একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসব।"

সে বুঝলে কিনা জানিনে, কচি-ছেলের মতো আবদারের সুরে বলতে লাগল—"আমায় ফেলে যেয়ো না।"

কাট্ একবার চারিদিকে তাকিয়ে বললে—"একটা পিস্তল বার করে শেষ করে দেব নাকি?"

নিয়ে যেতে যেতেই বোধ হয় ছেলেটি মারা যাবে, যদি বাঁচে তো

বড়ো জোর দু'তিন দিন। এতক্ষণ সে যেটুকু কষ্ট পেয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি কষ্ট মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার কপালে লেখা আছে। এখন সে বিকল, কিছুই অনুভব করতে পারছে না। এক ঘণ্টা পরে অসহ্য যন্ত্রণায় তাকে অবিরত চীৎকার করতে হবে। যত ঘণ্টা সে বেঁচে থাকবে তার যন্ত্রণার শেষ থাকবে না। এ যন্ত্রণা সে পাক বা না পাক তাতে কারও কিছু এসে যাবে না।

আমি ঘাড় নেড়ে বলি—"হ্যাঁ কাট্, আমাদের উচিত ওর এই যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দেওয়া!"

কাট্ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সে মনস্থির করেছে। আমরা ঘুরে দেখি আমরা আর একাকী নেই। গর্তের মধ্যে থেকে খানার মধ্যে থেকে লোকজন উঠে পড়েছে।

কি করব, আমরা একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসি।

কাট্ ঘাড় নেড়ে বলে—"এমন ছেলেটা—একেবারে দুধের বাছা—"

যতটা ক্ষতি হবে ভাবা গিয়েছিল ততটা হয়নি—পাঁচ জন মৃত, আট জন আহত। মোটের উপর একটা ছোটো-খাটো গোলাবৃষ্টি।

আমরা ফিরে গেলুম। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেল। সকালটা মেঘলা করে রয়েছে। বৃষ্টি শুরু হল।

এক ঘণ্টা পরে আমরা লরির কাছে পৌঁছে লরিতে উঠে পড়ি। আগের চেয়ে এখন জায়গা বেশি হয়েছে।

বৃষ্টি চেপে আসে। আমরা বর্ষাতির টুকরোগুলো মাথার উপর পেতে দিই। চড়বড় করে তার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে। গর্তে লরির চাকা পড়ে লাফিয়ে ঝাঁকানি দিতে দিতে চলে; আধঘুমন্ত অবস্থায় আমরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ি।

লরির সামনে দুটো লোক, তাদের হাতে দুটো লম্বা আঁকশি। তারা কেবল রাস্তার মাঝে যে-সব টেলিফোনের তার ঝুলে রয়েছে তাই লক্ষ্য করছে। ঘন ঘন এত তার গেছে যে সতর্ক না থাকলে লরি চলতে চলতে অনায়াসে আমাদের তারের ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। যেই তার আসছে, দুজনে দু'দিক থেকে আঁকশিতে করে তুলে ধরছে আর বলছে —"তার—হুসিয়ার—"আমরা শুনছি আধ-ঘুমন্ত অবস্থায়—হাঁটু মুড়ে একটু নিচু হচ্ছি, আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছি।

লরি চলছে তো চলেইছে। আঁকশি-ওয়ালারা একঘেয়ে সুরে হাঁক দিচ্ছে তো দিচ্ছেই—"তার—খবরদার—" বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই। আমাদের মাথার উপর জল ঝরছে, ফ্রন্টে মৃত সৈনিকদের উপর জল ঝরছে, কেমেরিখের কবরের উপর ঝরছে, আমাদের অন্তরের মধ্যে ঝরছে।

কোথায় একটা গোলাফাটার শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাই, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, লরির গা থেকে লাফিয়ে পড়বার জন্যে আমাদের পা তৈরি হয়ে ওঠে।

আর কোনোরকম উৎপাত ঘটল না। কেবল সেই একঘেয়ে হাঁক— "তার—খবরদার—" আমরা আবার নিচু হই, আবার আধ-ঘুমন্ত অবস্থা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমাদের গা-মাথা উকুনে ভর্তি হয়ে গেছে—বসে বসে আমরা উকুন বাছছি। একটা গুজব শুনেছিলুম হিমেল্স্টোশ নাকি এখানেও জ্বালাতে এসেছে। আমরা কাল তার সুপরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি। ক্রোপ্ আর মূল্যের দুজনে গল্প করছে। কোথা থেকে জানিনে ক্রোপ্ এক বাটি মটর-কলাই সিদ্ধ যোগাড় করে এনেছে। ম্যূলের আড়চোখে সে দিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—"আলবের্ট, এখন হঠাৎ যদি শান্তি স্থাপন হয়ে যায়, তুমি কি কর?" আলবের্ট বোকার মতো বলে—"এই ঝক্কাট থেকে পালিয়ে বাঁচি।" "তা তো নিশ্চয়ই, তারপর?" "মদ টেনে ভোঁ হয়ে যাই।" "বাজে কথা বোলো না, আমি সত্যি জিগগেস করছি।" ক্রোপ্ বলে—"আমিও তাই বলছি। এ ছাড়া লোকে আর কি করতে পারে?" কথাবার্তায় কাট্ আকৃষ্ট হয়। সে ক্রোপের মটরের বর্তনের প্রশংসা করে দু' একটা মুখে ফেলে একটু ভেবে বলে—"প্রথম চোটে হয়তো খুব মদ চালাবে, কিন্তু তারপর রেল ধরে বাড়ি ফিরে যেতে হবে মায়ের কাছে। মনে রেখো, শান্তির সময়ের কথা বলছি, আলবের্ট।" কাট্ তার অয়েল-ক্লথ মোড়া

নোট-বই ঘেঁটে একটা ফটোগ্রাফ বার করে সবাইকে দেখায়। "এরা সব আমার আপনার জন"—বলে আবার যথাস্থানে সেটা রেখে বলে ওঠে—"কোথাকার পোকা-পড়া পচা যুদ্ধ !"

আমি তাকে বলি—"তোমার ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে, তোমাদের এ কথা সাজে।"

সে ঘাড় নেড়ে বলে—"ঠিক কথা, তারা কিছু খেতে পাচ্ছে কিনা সেটা আমাদেরই দেখতে হয়।"

আমরা হেসে উঠে বলি—"তুমি থাকতে তাদের কোনোদিন অভাব হবে না, কাট্। খাবার তুমি কোথাও-না-কোথাও থেকে যোগাড় করবেই !"

ক্রোপ্ বলে—"ইয়াডেন, তুমি কি করবে ?"

ইয়াডেনের কেবল একমাত্র চিন্তা. সে বলে—"দেখব যাতে হিমেলস্টোশ আমার চেয়ে বড়ো পদ না পেয়ে যায়।"

মূল্যের বলে—"আর ডেটেরিং, তুমি ?"

ডেটেরিং মুখবোজা মানুষ, কিন্তু এ আলোচনায় সে যোগ দেয়। সে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে অল্পের মধ্যে বলে—"সোজা চলে যেতুম ক্ষেতে ফসল কাটতে !"

বলে সে উঠে চলে যায়। ও বড়ো উদ্বিগ্ন। ওর স্ত্রীকে ক্ষেতের কাজ করতে হয়। 'ফৌজের কর্তারা ওর একজোড়া ঘোড়া কেড়ে নিয়ে গেছে। প্রতিদিনের কাগজে সে দেখবার চেষ্টা করে তার ওল্‌ডেন্‌বুর্গের কোণটিতে বৃষ্টি হচ্ছে কি না।

এই সব কথা হচ্ছে, এমন সময় হিমেলস্টোশ এসে হাজির হয়। সে সিধে আমাদের দলের দিকে আসতে থাকে। ইয়াডেনের মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘাসের উপর চিতিযে শুয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে।

হিমেলস্টোশ একবার যেন একটু ইতস্তত করে, তারপর আস্তে

আস্তে পা ফেলে-ফেলে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। আমরা কেউ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাও করিনে। ক্রোপ্ খুব মনোযোগ দিয়ে তার দিকে চেয়ে দেখতে থাকে।

সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করে। কেউ যখন কিছুই বলে না, সে বলে ওঠে—"কি হে ?"

হিমেলস্টোশ কি করবে ঠিক বুঝতে পারে না। তার খুব ইচ্ছে আমাদের একবার কষে কুচ্‌কাওয়াজ করিয়ে নেয়। কিন্তু ফ্রন্ট-লাইন যে কুচ্‌কাওয়াজের মাঠ নয়, বোধহয় সে তা বুঝেছে।

ক্রোপ্ তার সবচেয়ে কাছে বসে ছিল বলে সে ক্রোপ্‌কে বলে—"এই যে তুমিও যে!"

কিন্তু ক্রোপের সঙ্গে তার ভাব-সাব ছিল না। সে একটু চড়ে গিয়ে বলে—"হ্যাঁ, তোমার চেয়ে অনেক আগেই এসেছি।"

হিমেলস্টোশ লাল গোঁফজোড়া চুম্‌রে বলে ওঠে—"তুমি যে দেখছি আমায় চিনতেই পারছ না।"

ইয়াডেন এইবার তার চোখ মেলে বলে—"আমি পারছি।"

হিমেলস্টোশ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে—"তোমার ভালো নাম কি, ইয়াডেন না ?"

ইয়াডেন অপমান করবার জন্যে প্রস্তুত হয়; মাথা তুলে বলে—"জান তুমি নিজে কি ?"

হিমেলস্টোশ বিচলিত হয়ে ওঠে; বলে—"কবে আমাদের এত ঘনিষ্ঠতা হল ? কৈ তোমার সঙ্গে এক খানায় পড়ে রাত কাটিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

খানার কথা শুনে ইয়াডেন প্রায় ক্ষেপে ওঠে; সে বলে—"না, সেখানে তুমি একলাই পড়েছিলে।"

হিমেলস্টোশ রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। কিন্তু ইয়াডেন

এবার ওকে টেক্কা দিয়েছে ; সে আজ আপমান করবেই—"তুমি কি তা জানতে চাও ? কুকুর—নর্দমার কুকুর। অনেক দিন ধরে এই কথাটা তোমায় বলবার জন্তে আমি অপেক্ষা করে আছি।"

—"নর্দমার কুকুর!" এটা বলে বহুদিনকার তৃপ্তি তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে ফুটে উঠল।

হিমেলস্টোশও গালাগালি শুরু করলে—"গোবর-চাটা মাটি-খেকো চাষা! দেখতে পাচ্ছিসনে তোর ওপরওয়ালা কথা কইছে।"

ইয়াডেন পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে বলে—"যা যাঃ, নিজের ল্যাজ কামড়াগে যা—"

সম্রাট কাইজেরকেও এর চেয়ে বেশি অপমানিত করা যায় না। হিমেলস্টোশ বললে—"ইয়াডেন, আমি তোমার ওপরওয়ালা জানো—হুকুম করছি, খাড়া হও!"

ইয়াডেন জিজ্ঞেস করলে—"আর কি হুকুম ?"

—"আমার হুকুম মানবে কি না ?"

ইয়াডেনের তাচ্ছিল্যের ভাব তখনও যায় না। হিমমেলস্টোশ গর্জে ওঠে—"দেখে নেব—তোমায় কোর্টমার্শাল করব।"

দেখি সে আপিস ঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভেস্টুস এত হাসে যে তার চোয়ালে খিল লেগে যায় ; হাঁ তার বন্ধ হতে চায় না ; আলবের্ট একটা ঘুষি মেরে তবে তার চোয়াল দোরস্ত করে দেয়।

কাট্ একটু বিচলিত হয়ে বলে—"যদি ও সত্যিই নালিশ করে তো ব্যাপার গুরুতর হবে।"

ইয়াডেন্ বলে—"সত্যিই নালিশ করবে ?"

আমি বলি—"অন্ততপক্ষে পাঁচদিনের জন্তে নির্জন কারাবাসে তো বটেই।"

ইয়াডেন তাতে ব্যস্ত হয় না, বলে—"পাঁচদিনের কারাবাস মানে পাঁচদিনের ছুটি।"
ইয়াডেন খুব ফুর্তিবাজ। সে ভেস্টুস্ আর লেএআরকে নিয়ে সরে পড়ে, যাতে প্রথম চোটে এসে তাকে কেউ খুঁজে না পায়।

ম্যুলেরের প্রশ্ন এখনও শেষ হয়নি, সে ক্রোপ্‌কে আবার বলে—"আলবের্ট, যদি সত্যিই তুমি এখন বাড়ি ফিরে যেতে পাও, তুমি কি কর?"
ক্রোপ্ বলে—"হয়তো ফিরে গেলে আবার সেই ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে।"
আমি বলি—"ইস্কুলে যা আমাদের শেখায়, সব বাজে।"
ক্রোপ্ আমায় সমর্থন করে বলে—"এখানে এই যুদ্ধের মধ্যে এলে ওদের ঐ শিক্ষা সত্যিই বাজে বলে মনে হয়।"
ম্যুলের বলে উঠে—"শুধু তোমার ইস্কুলের পরীক্ষা দিলেই তো আর চলবে না; রোজগারের ব্যবস্থা দেখতে হবে তো!"
আলবের্ট বলে—"তা ঠিক; কাট্, ডেটেরিং আর ভেস্টুস্ ওরা নিজের নিজের কাজে ফিরে যাবে। হিমেলস্টোশও যাবে। কিন্তু আমাদের তো তেমন কিছু নেই। এখান থেকে ফিরে গিয়ে কোন কাজে আমরা অভ্যস্ত হব?"
ম্যুলের বলে—"সত্যি আমাদের যে কি হবে—"
ক্রোপ্ কাঁধ নেড়ে বলে—"কে জানে? আগে ফিরে যেতে দাও, তারপর দেখা যাবে।"
আমরা যে কি করি ভেবে ঠিক ঠিকানা পাইনে।
ক্রোপ্ বলে—"আমি কিছু করতে চাইনে। একদিন না একদিন আমরা মারা যাবই—কি হবে ভেবে? আমাদের আর ঘরে ফিরতে হবে না।"

সত্যি, শান্তি স্থাপন হলে আমাদের যে কি হবে, একথা আমাদের বাড়ির লোকেরা একটুও ভাবে না। বছর-দুই ধরে ক্রমাগত গুলি, গোলা, বোমার গমাগম—একে ফস্ করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া কি সহজ?

শুধু আমাদের এখানে নয়—সব জায়গাতেই এই এক অবস্থা—আমাদের বয়সের সকলেই এই একই কথা ভাবছে—কেউ বেশি ভাবছে, কেউ কম।

আলবের্ট বলে—"যুদ্ধটা আমাদের সব দিকেই দফা রফা করলে।"

কথাটা বলেছে ঠিক—আমাদের যৌবন আর নেই। আমরা যেন সব পলাতকের দল। নিজের কাছ থেকে, এমন কি জীবনের কাছ থেকেও দূরে সরে পড়বার জন্যে আমরা যেন দৌড় মেরেছি। আঠারো বছর বয়েস যখন সবে আমরা পৃথিবীকে এবং এই জীবনকে ভালোবাসতে শিখেছি সেই সময় গুলির চোটে সেই মায়াটুকু ধ্বংস করে দিতে হয়েছে। প্রথম বোমা যেটা ফেটেছিল, সেটা যেন আমাদের অন্তরের মধ্যেই ফেটেছিল। কর্ম, চেষ্টা এবং উন্নতির পথ আমাদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। ও-সবে আমাদের আর বিশ্বাস নেই—বিশ্বাস করি কেবল লড়াইকে।

আপিস ঘরে যেন একটু চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। হিমেলস্টোশ গিয়ে বোধ হয়, খোঁচাখুঁচি লাগিয়েছে। সবার আগে আসছেন স্থূলকায় সার্জেন্ট-মেজর গদাইলস্করি চালে। এ বড়ো আশ্চর্য যে সব সার্জেন্ট মেজের-গুলোই কি ভোঁদা হবে? হিমেলস্টোশ তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। তার বুট জুতো রোদে চক্‌চক্ করে উঠছে।

আমরা উঠে দাঁড়াই।

সার্জেণ্ট বলে—"ইয়াডেন কোথায় ?"

কেউ যে জানি এমন ভাব দেখালুম না। হিমলস্টোশ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে—"তোমরা বেশ ভালো করেই জানো। বলবে না তাই বল।"

মোট্‌কা সার্জেণ্ট এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখেন। ইয়াডেনের দেখাই নেই। তখন তিনি আর এক ফন্দি বার করে বলেন—"আর দশ মিনিটের মধ্যে ইয়াডেন যেন আফিস ঘরে গিয়ে খবর দেয়।" বলে হিমলস্টোশকে সঙ্গে নিয়ে মেজের-সাহেব ফিরে যান।

আমি ঝুপড়িতে গিয়ে ইয়াডেনকে সাবধান করে দি। সে লম্বা দেয়।

তারপর আমরা শুয়ে পড়ে তাশ খেলতে থাকি।

আধ ঘণ্টা পরে হিমলস্টোশ আবার ফিরে আসে। কেউ তার দিকে মন দেয় না। সে ইয়াডেনের কথা জিজ্ঞেস করে, আমরা পিঠ ফিরিয়ে বলি, "জানিনে।"

সে বলে—"তবে তোমরাই তাকে খুঁজে বার কর। তোমরা কি তাকে খুঁজতে যাওনি নাকি ?"

ক্রোপ্‌ ঘাসের উপর শুয়ে বলে—"তুমি লড়াইয়ের জায়গায় কখনও এসেছ এর আগে ?"

হিমেলস্টোশ বলে—"সে কথায় তোমার কাজ কি ? আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।"

ক্রোপ্‌ দাঁড়িয়ে উঠে বলে—"বটে, ঐখানে তাকিয়ে দেখ দেখি, যেখানে ছোটো ছোটো শাদা মেঘের মতো ধোঁয়া ভাসছে—ওগুলো উড়ো জাহাজ মারবার গোলার ধোঁয়া। ঐখানে কাল আমরা গিয়েছিলুম। পাঁচজন মারা গেছে, আটজন জখম। ভারি মজা হয়েছিল। এর পর যখন তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে, সৈনিকেরা

মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তোমার সামনে এসে গোড়ালি ঠুকে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বলবে—'এবার যেতে পারি হুজুর? এবার মরতে পারি হুজুর?' ঠিক তোমারই মতো একজন উপরওয়ালার জন্যে এতদিন আমরা অপেক্ষা করে ছিলুম।"

এই বলেই সে বসে পড়ল। হিমেলস্টোশ উল্কার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাট্ আঁচ করে বললে—"লিখে রাখ তোমার তিন দিনের সি. বি. হয়ে বসে আছে।"

আমি আলবার্টকে বললুম—"এর পরের বারে আমার মনে যা আছে আচ্ছা করে শোনাব।"

কিন্তু হিমেলস্টোশ আর এল না। সন্ধ্যার সময় বিচার-সভা বসল। কাছারিঘরে আমাদের লেফটেনেণ্ট বের্টিঙ্ক বসে এক-একজনকে ডাকতে লাগলেন।

ইয়াডেনের অবাধ্যতার কারণ দেখাবার জন্যে আমায় সাক্ষ্য দিতে হল। বিছানায় প্রস্রাব করার গল্পটায় খুব কাজ হল। হিমেলস্টোশকে ডাকা হতে আমি আমার জবানবন্দির পুনরুল্লেখ করলুম।

বের্টিঙ্ক হিমেলস্টোশকে জিগগেস করছেন—"এটা কি সত্যি?"

হিমেলস্টোশ কথাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ক্রোপ্‌ও ঐ এক-কথা বলতে সেটা সে স্বীকার করলে।

বের্টিঙ্ক বললেন—"তবে আগে এই ব্যাপারটা জানানো হয়নি কেন?"

আমরা মুখ বুজে থাকি। তিনি নিজে নিশ্চয় জানেন সৈন্যবিভাগে এই সবের জন্যে নালিশ করতে যাওয়ায় কোনো লাভ নেই। সৈন্য-বিভাগে নালিশ করার রীতি বড়ো-একটা নেই। তিনি সেটা বুঝে হিমেলস্টোশকে তিরস্কার করে বুঝিয়ে দেন যে ফ্রণ্টটা কুচকাওয়াজের মাঠ নয়। তারপর ইয়াডেনের পালা আসে। তাকে একটা লম্বা উপদেশ শোনাবার পর তিনদিনের খোলা পাহারায় রাখার হুকুম

হয়। ক্রোপের জন্তে একদিনের খোলা পাহারা। তিনি চোখ মট্‌কে একটু দুঃখিত সুরে বলেন—"কি করা যাবে, আর কোনো তো উপায় নেই।" বোর্টিঙ্ক বেশ ভদ্রলোক।

খোলা পাহারা বেশ সুন্দর জিনিস। জেলখানাটা এককালে ছিল মুরগীর ঘর। সেখানে গিয়ে আমরা বন্দীদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে পারি। কি করে সে বন্দোবস্ত করতে হয় তা আমাদের জানা আছে।

আগে গাছের সঙ্গে বন্দীদের বেঁধে রাখা হত—এখন সে নিয়ম উঠে গেছে। অনেক বিষয়েই বন্দীদের সঙ্গে আজকাল মানুষের মতো ব্যবহার করা হয়।

এক ঘণ্টা পরে জালের বেড়ার পিছনে ইয়াডেন আর ক্রোপ্ সুস্থ হয়ে বসলে আমরা সেখানে প্রবেশ করে অনেক রাত্রি অবধি তাশ পিটি আর স্ক্যাট খেলি।

যখন আমরা আড্ডা ভেঙে উঠি কাট্ বলে—"এখন হাঁসের মাংসের রোস্ট কেমন লাগবে?"

আমি বলি—"মন্দ নয়।"

যে বাড়িতে হাঁস ছিল সে জায়গাটা কাট্ ঠিক মনে করে রেখেছিল। আমরা একটা চলন্ত মাল-গাড়িতে উঠে পড়ি। এর জন্তে আমাদের দুটো সিগারেট ঘুষ দিতে হয়। যেখানে হাঁস আছে সেটা যুদ্ধ-বিভাগেরই একটা চালা ঘর। আমি হাঁস আনতে রাজী হয়ে কাটের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করি।

কাট্ আমায় উঁচু করে তুলে ধরে। আমি তার হাতে পা দিয়ে দেয়াল টপকে ভিতরে গিয়ে পড়ি। কাট্ বাইরে পাহারা দেয়।

চোখ থেকে অন্ধকারের ধাঁধা কাটতে কিছুক্ষণ লাগে। খানিক

পরে হাঁসের ঘরটা দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে হুড়কো তুলে দরজা খুলে ফেলি।

অন্ধকারের মধ্যে দুটো শাদা জিনিস চোখে পড়ে। দুটো হাঁস—লক্ষণ খারাপ, যদি একটাকে খপ্ করে ধরি অপরটা প্যাঁক প্যাঁক করে উঠবে। বেশ, দুটোকেই ধরব—যদি তাগ মতো ঝপ করে ধরতে পারি তো মার দিয়া।

আমি লাফ দিয়ে তাদের একটার পর আর একটাকে চট্ করে ধরে ফেললুম। পাগলের মতো আমি তাদের মাথা দুটো দেওয়ালের গায়ে আছড়াতে থাকি। পাখিদুটো তাদের পা আর ডানা দিয়ে ঝাপট্ মারতে থাকে। আমি মরিয়া হয়ে হাত চালাই। উঃ বাপ্—হাঁসের পায়ের কি জোর! ধবস্তাধবস্তিতে আমায় টলমলিয়ে দেয়। মনে হয় যেন আমার হাতে একজোড়া পাখা গজিয়েছে। ভয় হচ্ছে, এখনই আকাশে উড়িয়ে নেবে।

একটা হাঁস একবার দম পেয়ে ভড়কা ঘড়ির মতো ক্যাঁক ক্যাঁক করে ওঠে। আমি কিছু করবার আগেই বাইরে থেকে কি একটা ছুটে আসে; আমি একটা আঘাত পেয়ে মেঝের উপর পড়ে যাই, আর কানের কাছে একটা ভীষণ গোঙরানি শুনি। একটা কুকুর। একটু পাশ ফিরতেই আমার গলাটা কামড়াবার চেষ্টা করে।

দেখলুম একটা ডালকুত্তা। যেন একযুগ পরে সে তার মুখখানা সরিয়ে নিয়ে আমার পাশে বসে পড়ে। কিন্তু যদি আমি একটু নড়াচড়া করি সঙ্গে সঙ্গে সে গোঁ গোঁ করে ওঠে। আমি একটু ভেবে দেখি। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে আমার ছোটো রিভল্ভারটা হাতে নেওয়া, তাও কেউ এসে পড়বার আগে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে আমার হাত এগোতে থাকে।

মনে হয় যেন এক ঘণ্টা ধরে হাতই সরাচ্ছি। একটুখানি

নড়েছি কি সেই বীভৎস গোঁ গোঁ! অবশেষে যখন রিভলভারটা হাতে ঠেকে, আমার হাত কাঁপতে থাকে। আমি মনে মনে বলি—এক ঝটকায় রিভলভারটা তুলে ধর, ও কামড়াবার আগেই গুলি ছুঁড়ে দাও, তারপর এক লাফ!

আস্তে আস্তে আমি একটা দম টেনে নি। তারপর এক ঝটকায় রিভলভার বার করি—দড়াম করে শব্দ হয়, কুকুরটা চীৎকার করে একদিকে পড়ে যায়। আমি দরজার দিকে দৌড় দিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে একটা হাঁসের উপর পড়ে যাই।

সেটাকে তুলে নিয়ে পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে পাঁচিলের উপর লাফিয়ে উঠে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা উঠে পড়ে ছুটে আমার দিকে লাফিয়ে আসে। আমি এক লাফে বাইরে নেমে পড়ি। কাছেই কাট্ বগলে হাঁসটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে প্রাণপণে ছুট দিই।

কিছুদূর দৌড়ে একটু হাঁপ ছাড়বার অবসর পাই। হাঁসটা মরে গেছে। আমরা ঠিক করি কাউকে না জানিয়ে সেটাকে রোস্ট্ করব। আমি একটা স্টোভ আর কিছু কাঠ কুটির থেকে যোগাড় করে নিয়ে আসি। তারপর সব জিনিস নিয়ে একটা খালি ঘরের মধ্যে গুড়ি মেরে ঢুকে পড়ি। একটিমাত্র জানলা—তাও মোটা পর্দায় ঢাকা। একটা উনুনের মতো আছে—তাতে আমরা আগুন জ্বালি।

কাট্ হাঁসটাকে ছাড়িয়ে ফেলে। পালকগুলোকে আমরা একধারে সরিয়ে রাখি। ফ্রন্টের কামানের গর্জন আমাদের আশ্রয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। আগুনের আঁচে আমাদের মুখ আলো হয়ে ওঠে, দেয়ালের উপর ছায়া নাচতে থাকে। এক একটা গুরু গর্জন আর ঘরটা কাঁপতে থাকে—উড়ো-জাহাজ থেকে বোমা ফেলছে। একবার একটা

অস্ফুট চীৎকার শুনতে পাই—নিশ্চয় কোনো কুটিরের উপরে গোলা পড়েছে।

উড়ো-জাহাজের গর্জন আর মেশিনগানের নটখটি শব্দ কানে আসে। কিন্তু আমাদের চালাঘর থেকে এমন কোনো আলো বাইরে যাচ্ছে না, যাতে আমরা ধরা পড়ে যাই।

কাট্ আর আমি দুজনে মুখোমুখি বসে মাঝরাতে হাঁসের মাংস রোস্ট করছি। কারও মুখে কথা নেই।

ঘরের মধ্যে আমরা জীবনের দুটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ; বাইরে অন্ধকার রাত্রিটা মৃত্যু দিয়ে ঘেরা। ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে টুলের এক পাশে আমরা বসে আছি। আমাদের হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা চর্বি পড়ছে। হাঁসটাকে মাঝে রেখে আমরা দুজনে বসে আছি। এক সঙ্গে দুজনে একই কথা ভাবছি। আমাদের অনুভূতি পর্যন্ত যেন এক হয়ে গেছে। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এত গভীর যে একটি কথা বলবার পর্যন্ত দরকার হচ্ছে না।

কচি হলেও হাঁস রোস্ট হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। কাজেই আমরা পালা করে নিই। একজন রোস্ট করে, অপরজন ঘুমিয়ে নেয়। ক্রমে একটা খোসবোতে কুটির ভরে যায়।

বাইরের কোলাহল আরও বেড়ে ওঠে। ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্নের মধ্যেও সেই কোলাহল এসে প্রবেশ করে। আধ ঘুমে দেখতে পাই কাট্ হাতটা ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে।

কাট্ উনুনের কাছে গিয়ে বলল—"রান্না প্রস্তুত।"

ঘরের মধ্যে পোড়া হাঁসটা চক্‌চক্ করছে। আমরা আমাদের পকেট-কাঁটা-ছুরি বার করে দুজনে দুটো ঠ্যাং কেটে নি। এর সঙ্গে ঝোলে চোবানো ফৌজি রুটি চলতে থাকে। আমরা ধীরে সুস্থে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাই।

—"ক্রোপ্ আর ইয়াডেনের জন্যে একটু করে মাংস নিয়ে গেলে কেমন হয়, কাট্ ?"

সে বলে —"ভালোই হয়।"

আমরা সাবধানে এক অংশ কেটে নিয়ে খবরের কাগজে মুড়ে রাখি।

বাকিটা ভাবি আমাদের কুটিরে নিয়ে যাব।

কাট্ একটু হেসে বলে—"ইয়াডেন!"

ঐটুকু মাংসতে ইয়াডেনের পেট ভরবে না জেনে সবটাই নিয়ে যাব স্থির করি। কাজেই ঝোল সমেত সমস্ত মাংসটা নিয়ে মুরগীর ঘরের জেলখানায় গিয়ে তাদের ঠেলে তুলি।

ক্রোপ্ আর ইয়াডেন ভাবে, আমরা বুঝি যাদুকর! তারপর তারা মুখ চালাতে থাকে। ইয়াডেন চুমুক দিয়ে ঝোলটা খেয়ে বলে—"তোমাদের কখনও ভুলব না।"

আমরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে চলি। আবার সেই নক্ষত্রে ভরা উদার আকাশ—তার গায়ে উদয়রাগের চিহ্ন, তার তলা দিয়ে আমি হেঁটে চলি—পায়ে ভারি বুট, ভরা পেট—আমার পাশে কাটখোট্টা কোলকুঁজো কাট্—আমার কম্‌রেড।

সারি সারি কুটিরের ছবি স্বপ্নের মতো আমাদের চোখে পড়ে!
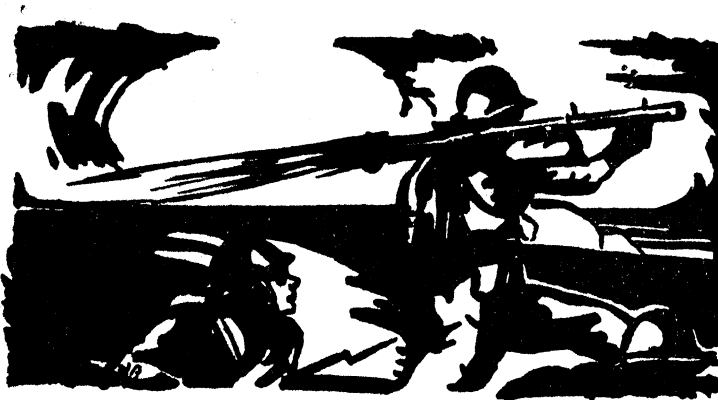
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপক্ষরা আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এমনি একটা গুজব শোনা যাচ্ছে। এবারে ছুটি ফুরোবার দুদিন আগেই আমাদের ফ্রন্টে যেতে হবে। পথে গোলার ঘায়ে চুরমার একটা ইস্কুল-বাড়ি পেরিয়ে গেলুম। ইস্কুল-বাড়িটার একধারে দু'সার নতুন তৈরি হলদে কাঠের কফিনের পাঁচিল খাড়া হয়ে রয়েছে—এখনও কফিনগুলো থেকে নতুন চাঁচা দেবদারু আর পাইন কাঠের সুগন্ধ বেরচ্ছে। গুণতিতে প্রায় শ'খানেক কফিন হবে। ম্যুল্যের একটু আশ্চর্য হয়ে বললে—"এবারকার আক্রমণের আয়োজন বড়ো মন্দ দেখছিনে তো!" ডেটেরিং বললে—"ওগুলো আমাদেরই জন্যে।" কাট্ চটে বলে উঠল—"বাজে বকিসনে।" ইয়াডেন বললে—"কপালে যদি ভাই একটা কফিন জোটে তো নিজেকে কৃতার্থ মনে করো। এই বুড়ো ধড়্খানার জন্যে একটা ছেঁড়া চটের থলি, তাও মিললে হয়।" আর সবাইও তামাশা করে। এ রকম তামাশা অপ্রীতিকর হলেও তা ছাড়া আর করাই বা যায় কি! কফিন-গুলো সত্যিই আমাদের জন্যে। আমাদের সম্মুখ দিকটা সবই যেন বিজ্ বিজ্ করছে। প্রথম রাত্রে আমরা আমাদের অবস্থাটা বোঝাবার

চেষ্টা করি। যখন চারিদিক বেশ শান্ত থাকে, শত্রুশ্রেণীর পিছনে অনবরত ঘড়্ ঘড়্ গাড়ির শব্দ সারা রাত শোনা যায়। কাট্ বল্লে যে ওরা ফিরে যাচ্ছে তা নয়—অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি আনছে।

ইংরেজদের গোলন্দাজদের দল যে আরও পুরু করা হয়েছে তা আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। পঁচিশ-পঁচিশ কামানের অন্তত আরও চার-চারটে ব্যাটারি ডানদিকে রাখা হয়েছে; আর গাড়ার ভিতরে গোলা বর্ষণের উপযুক্ত কামান—তাও লুকনো রয়েছে এই পপ্‌লার গাছগুলোর আড়ালে। এ ছাড়া ওরা কতগুলো ছোটো ছোটো মারাত্মক রকমের তোপ ফরাসি-মুলুক থেকে আনিয়ে রেখেছে।

ফ্রণ্ট যেন একটা খাঁচাকল। এর মধ্যে কখন কি ঘটে তারই অপেক্ষায় আমরা তটস্থ হয়ে বসে থাকি। নানা দিক থেকে ছুটন্ত কামানের গোলা মাথার উপর যেন একটা জালের ঘের তৈরি করে, তারই তলায় আমরা অনিশ্চিত উদ্বেগ নিয়ে পড়ে থাকি। আমাদের উপরে দৈব যেন দিনরাত সমানে ঘুরছে। যদি একটা গোলা আসে আমরা কেবল উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে পারি, আর কিছু করতে পারিনে। আমরা জানিনে, ঠিকও করতে পারিনে, কোথায় সেটা পড়বে না পড়বে।

এই দৈবই আমাদের উদাসীন করে রাখে। কয়েককমাস আগে আমি একটা ডাগ-আউটের মধ্যে বসে স্ক্যাট্ খেলছিলুম। কিছুক্ষণ পরে উঠে আমি অন্য এক গোফায় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ফিরে এসে আমাদের গোফার আর কোনো চিহ্নই দেখতে পেলুম না। সোজা একটা গোলা এসে সেটাকে উড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়টায় ফিরে এসে দেখি সেটাকে খুঁড়ে মানুষগুলোকে বার করবার চেষ্টা হচ্ছে, এই গেলুম আর এলুম ইতিমধ্যে সেটাও ধ্বসে পড়ে গেছে।

কেবল দৈববলে আমি এখনও বেঁচে আছি। যেমন দৈবাৎ বেঁচে গেলুম তেমনি দৈবাৎ চোটও লাগতে পারত। অভেদ্য গোফার মধ্যেও আমি গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যেতে পারি, আবার হয়তো খোলা মাঠের মধ্যে দশ ঘণ্টা গোলাবর্ষণের পর দেখব আমার গায়ে একটিও আঁচড় লাগেনি। কোনো সৈনিকের পক্ষে দৈবের বলে যুদ্ধক্ষেত্রের সহস্র বিপদ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় জানি, তবু সকলেই আমরা দৈবে বিশ্বাস করি এবং ভাগ্যের উপর বরাত দিয়ে থাকি।

আমাদের রুটিগুলোকে বড্ড সামলে রাখতে হচ্ছে। ট্রেঞ্চগুলো আগের মতো মেরামত নেই বলে ইঁদুরের উৎপাত বড়ো বেড়ে উঠেছে। ডেটেরিং বলে যে একটা গোলাবৃষ্টি হবে, এ তারই লক্ষণ।

এখানকার এই মোটা মোটা ইঁদুরগুলো অতি জঘন্য—আমরা এদের বলি মড়াখেকো ইঁদুর। এদের বিশ্রী বীভৎস মুখ আর লোমহীন লম্বা ল্যাজগুলো দেখলে গা যেন ঘুলিয়ে আসে।

ব্যাটাদের পেটে যেন আগুন জ্বলছে। প্রত্যেক সৈনিকেরই রুটি একটু করে কুরে খাওয়া। ক্রোপ্ তার রুটি বর্ষাতিতে জড়িয়ে তার মাথার তলায় রেখেছে, কিন্তু ঘুমোবার জো নেই—রুটির গন্ধে তার মুখের উপর দিয়ে তারা দৌড়াদৌড়ি করছে। ডেটেরিং ইঁদুরগুলোকে ঠকাবার এক মৎলব বার করেছে। সে ঘরের ছাদে এক টুকরো তার বেঁধে তাতে রুটি ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই—রাত্রে সে টর্চ জ্বেলে দেখে যে তার রুটি এদিক ওদিক দুলছে, রুটি জাপটে ধরেছে একটা প্রকাণ্ড মোটা ইঁদুর!

শেষকালে আমরা ঠিক করলুম, এর একটা বিহিত না করলেই নয়। রুটিগুলো ফেলে দিতে আমরা পারব না, কারণ কাল সকালে

খাবার মতো বস্তুত কিছুই নেই। কাজেই যেখানটুকু ইঁদুরে খেয়েছে সেগুলো ছুঁরিতে করে কেটে বাদ দি।

কাটা টুকরোগুলোকে মেঝের মাঝখানে এক জায়গায় জড়ো করা হয়। প্রত্যেকে তার কোদালি বার করে তৈরি হয়ে থাকে। ডেটেরিং ক্রোপ্ আর কাট্ তাদের ল্যাম্প নিয়ে প্রস্তুত থাকে।

কয়েক মিনিট পরেই খুস্‌খাস্ শব্দ পাই। ক্রমে শব্দ জোরে হয়। ছোট ছোট পায়ের শব্দ। তারপর টর্চগুলো জ্বলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে রুটির স্তূপের উপর আঘাত করে। ফল মন্দ হয় না। আমরা মরা ইঁদুরগুলোকে পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার অপেক্ষা করে থাকি।

এমনি বার বার হতে থাকে। শেষটা ইঁদুরগুলো চালাক হয়ে পড়ে। বোধ হয় রক্তের গন্ধ পায়। আর তারা আসে না। তা হলেও মেঝের উপর যেটুকু রুটি পড়ে থাকে সকালের আগেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

পরের দিন আমাদের এডামার পনীর খেতে দেওয়া হয়। প্রত্যেকে প্রায় সিকিখানা করে পনীর পায়। এক হিসেবে ভালোই, কারণ এডামার খেতে খুব সুস্বাদু, কিন্তু আর এক হিসেবে বড় ভালো নয়, কারণ ঐ গোল-গোল লাল টিনগুলো যখন এসেছে তখনই বোঝা যাচ্ছে যে শীঘ্রই খারাপ সময় আসছে, তাই এত তোয়াজ। যখন আমাদের 'রম্' পরিবেশন করা হয় অমঙ্গলের সূচনা আরও বেড়ে ওঠে! আমরা খাই না যে তা নয়, কিন্তু খেয়ে সুখ পাইনে।

ইঁদুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে দিনের পর দিন আমরা ঘুরে বেড়াই। বন্দুকের গুলি আর হাত-বোমা বেশি বেশি আসতে থাকে। আমরা বন্দুকের সঙিনগুলো পর্যন্ত সাফসোফ করে নিতে থাকি।

কিন্তু সঙিনের ব্যবহার আজকাল প্রায় উঠেই গেছে। আজকাল

নিয়ম হচ্ছে বোমা আর কোদাল নিয়ে আক্রমণ করা। ধারালো কোদাল অনেক রকমে ব্যবহার করা চলে এবং চট্ করে ঘা দেওয়া যায়। যদি একবার ঘাড় আর কাঁধের মধ্যে ঘা বসানো যায় তা অনায়াসে বুক পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেলা যায়। সঙিন দিযে আক্রমণ করলে সাধারণত হাড়ের মধ্যে আটকে যায়, তখন যার হাড়ে আটকে গেছে তার পেটে জোরে লাথি মেরে তবে সঙ্গিন টেনে বার করে নিতে হয়। আরো মুশকিল সঙিনের ফলা প্রাযই যায় ভেঙে।

রাত্রিবেলা শত্রুদের তরফ থেকে গ্যাসের গোলা ছোঁড়া হয়। আমরা গ্যাসের মুখোস এঁটে আশা করে বসে রইলুম এর পরই আক্রমণ আসবে, এবং তৈরিও হযে রইলুম শত্রুদেব প্রথম দর্শনেই এক টানে মুখোস খুলে ফেলব বলে।

কিছু ঘটল না—সকাল হল। কেবল বিপক্ষ-শ্রেণীব পিছনে গাড়ির গড়গড়ানি—ট্রেনের পর ট্রেন, লরির পর লরি, এত কি এনে জমা করছে ওরা! আমাদের গোলন্দাজরা ঐ দিকটায় তাগ করে অনবরত গোলাবর্ষণ করে চলেছে, তবুও ওদের চলাচলের বিরাম নেই।

আমাদের মুখের ভাব অবসন্ন—আমরা পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে চলি। কাট্ বিষণ্ণভাবে বলে—"এও দেখছি 'সম্'-এর মতো হবে। সেখানে সাতদিন সাতরাত্রি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ হয়েছিল।" আমরা এখানে আসার পর থেকে কাটের আর সে ফুর্তি নেই। লক্ষণ বড়ো খারাপ, কারণ কাট্ হচ্ছে ফ্রন্টের ওয়াকিবহাল—বুড়ো ঘাগী সেপাই—কি ঘটবে তা সে আগে থেকেই বুঝতে পারে। কেবল ইয়াডেনের এখনও ফুর্তি যায়নি—ভালো আহার আর 'রম্' পেয়ে সে খুব খুশি। সে এখনও ভাবে আমরা নিরাপদে ফ্রন্ট থেকে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পাব।

অবশ্য ব্যাপার দেখে শুনে অনেকটা তাই মনে হয়। দিনের পর দিন

সাফ্‌ কেটে যায়। রাত্রিবেলা আমি ঘাঁটিতে গুঁড়ি মেরে বসে পাহারা দি আর শুনি কোন দিক থেকে কি শব্দ আসছে। মাথার উপর হাউই উঠতে থাকে, প্যারাসুটের আলো জ্বলতে জ্বলতে নামতে থাকে। আমি সজাগ সচকিত হয়ে বসে থাকি, বুক দুরু দুরু করতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে ঘন ঘন কেবলই আমার ঘড়ির জ্বলজ্বলে চাক্‌তিটার উপর চোখ পড়ে; ঘড়ির কাঁটা যেন সরতেই চায় না। আমার চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে আসে, জেগে থাকবার জন্যে আমি পায়ের আঙুল নাচাতে থাকি। পাহারা বদলি হওয়ার পর্যন্ত বিশেষ কিছুই ঘটে না—কেবল ঐখানকার সেই অফুরন্ত ঘর্ঘর শব্দ। ক্রমে আমরা ঠাণ্ডা হয়ে 'স্ক্যাট' আর 'পোকার' খেলতে বসি। কে জানে হয়তো আমাদের কপাল ভালো হতেও পারে!

সারাদিন আকাশে অবজারভেশন বেলুন উড়তে থাকে। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে শত্রুপক্ষ চলন্ত ট্যাঙ্ক আর নিচু-আকাশে ওড়া উড়ো-জাহাজ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে। কিন্তু সেটার চেয়ে নতুন যে সর্বনেশে আগুন-ফেলা কলের কথা শুনেছি তারই কথা আমরা বেশি করে ভাবি।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। পৃথিবী যেন গর্জন করছে। আমাদের উপর ঘন ঘন গোলাবর্ষণ হচ্ছে। আমরা এক কোণে গুড়ি মেরে বসি। প্রত্যেকে নিজের নিজের জিনিসপত্র কাছে নিয়ে বসে থাকি, প্রতি মুহূর্তে ফিরে ফিরে দেখি সেগুলো ঠিক আছে কি না। গোফাটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে থাকে। চকিত ঝিলিকে আমরা পরস্পরের মুখ দেখতে পাই, আমাদের মুখ শাদা হয়ে গেছে।

সকলেই বুঝছি ঘন গোলাবর্ষণে দেওয়াল প্রাচীর সমস্ত ভেঙে যাচ্ছে,

পেটা ছাদের কংক্রিটের আস্তরণ ধ্বসে যাচ্ছে। সকলের মধ্যেই কয়েক-জন নতুন রংরুট ভয়ে সিটে মেরে বমি করা শুরু করেছে। তারা এই রকম গোলাবর্ষণ কখনও দেখেনি।

ধীরে ধীরে দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের ঘাঁটিতে আলো এসে পড়ে। গোলাফাটার দীপ্তি ম্লান হয়ে যায়। সকাল হয়েছে। গোলাগুলি ছোঁড়ার শব্দ ও মাটি-ফাটার শব্দ এক সঙ্গে মিলে ভীষণ হয়ে ওঠে। এই তুমুল কোলাহলে মাথা যেন বিগ্‌ড়ে যায়।

সাহায্যকারী সৈনিকেরা বাইরে যায়। ধুলোমাটি মেখে প্রহরীগুলো টলতে টলতে ঘরে এসে ঢোকে। একজন কোনো কথা না বলে এককোণে বসে খেতে থাকে, অপর একজন নতুন সৈনিক কাঁদতে থাকে।

নতুন রংরুটরা তার দিকে লক্ষ্য করছে। এ কাঁদা রোগটা ছোঁয়াচে, তাই আমরা নজর রেখেছি। এরই মধ্যে কারও কারও ঠোঁট কাঁপতে আরম্ভ করেছে; তবু ভালো যে রাত কেটে গেছে; হয়তো দুপুরের আগেই আক্রমণটা এসে পড়বে।

গোলাবর্ষণ একটুও কমে না। আমাদের পিছনেও গোলা পড়ছে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি কেবল যেন মাটি আর লোহার ফোয়ারা ছুটে ছুটে উঠছে।

আক্রমণ আসে না, কিন্তু গোলাবৃষ্টি চলতেই থাকে। আস্তে আস্তে আমরা চুপ হয়ে যাই। কেউ আর কথা কয় না। আমাদের মনের ভাব প্রকাশের কোনো ক্ষমতা থাকে না।

আমাদের দিকের ট্রেঞ্চটা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বহু জায়গায় আঠারো ইঞ্চির বেশি উঁচুই নেই: কত জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে, ফেটে গেছে, মাটির পাহাড় জমে উঠেছে, তার ঠিক নেই। আমাদের দরজায় ঘাটির ঠিক সামনে একটা গোলা এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল। মাটিতে গোফার মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন নিজেদের মাটি খুঁড়ে

বার হতে হবে। এক ঘণ্টা পরে বাইরে যাবার পথ পরিষ্কার হয়, আমরাও কিছু হাতের কাজ করে কতকটা শান্ত হই।

আমাদের কমান্ডা এসে খবর দেন যে দুটো গোফা উড়ে গেছে। রংরুটরা তাঁকে দেখে কিছু ঠাণ্ডা হয়। তিনি বলেন, আজ সন্ধ্যার সময় খাবার আনবার জন্যে চেষ্টা করা হবে।

ইয়াডেন ছাড়া একথাটা কারও মনে উদয় হয়নি। যাই হোক, শুনে তবু আশ্বাস হয়, বাইরের জগতটাকে তবু যেন একটু কাছে পেলুম। রংরুটরা ভাবে, যদি এখনও খাবার আনবার উপায় থাকে তাহলে অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ হয়নি।

আমরা তাদের এ ভুল ভেঙে দিই না। আমরা জানি এ সময় বোমা-গুলিরও যেমন দরকার তেমনি খাদ্যও দরকারি। কেবল সে কারণে যেমন করে হোক খাবার আনা চাই-ই।

কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায়। দু'বার দু'দল গিয়ে ফিরে আসে। শেষে কাট্ চেষ্টা করে, সেও কিছুই করতে না পেরে ফিরে আসে। এই আগুনের বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে একটা মাছি পর্য্যন্ত গলতে পারে না।

আমরা কোমরবন্ধটা খুব এঁটে পরে, এক গ্রাস খাবার তিনগুণ সময় ধরে চিবিয়ে খাই। তবুও খাবার ফুরিয়ে যায়; ক্ষিদেয় পেট জ্বলতে থাকে। আমি ছোটো এক টুকরো রুটি বার করে শাদা অংশটা রেখে খোলাগুলো আমার ঝোলার মধ্যে রেখে দি; থেকে থেকে সেইগুলো একটু একটু চিবুতে থাকি।

রাত্রি আর কাটতে চায় না—অসহ্য হয়ে ওঠে; কারও ঘুম নেই, কেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, থেকে থেকে ঢুলুনি আসে। ইয়াডেন দুঃখ করতে থাকে যে কাটা রুটির টুকরোগুলো আমরা ইঁদুরকে খাইয়ে

নষ্ট করলুম। আমাদের জল কম পড়েছে বটে, তবে এখনও সাংঘাতিক রকমে নয়।

ভোরের অন্ধকারে দরজার মধ্যে দিয়ে একপাল ইঁদুর কিল্‌বিল্‌ করে ঢুকে পড়ে। চারিদিক থেকে টর্চ জ্বলে ওঠে। সকলে চীৎকার করে গালাগালি দিয়ে ইঁদুর মারতে থাকে। এই হত্যাকাণ্ডে আমাদের অনেক ঘণ্টার মনের ঝাল মেটে। মুখ বিকৃত করে এক ঘা লাঠি বসাই, আর ইঁদুরদের কিচ্‌মিচ্‌।

এই রকম মারপিটে আমরা হাঁপিয়ে পড়ি। আমরা আবার শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আশ্চর্য এই যে এ পর্যন্ত আমাদের ঘাটিতে কেউ চোট পায়নি!

একজন কর্পোরাল গুড়ি মেরে এসে ঢোকেন তাঁর সঙ্গে একখানা পাঁউরুটি। রাত্রির অন্ধকারে তিন জন সৌভাগ্যক্রমে পিছনে গিয়ে খাবার নিয়ে আসতে পেরেছে। তারা বললে যে এখান থেকে গোলন্দাজ-শ্রেণী পর্যন্ত সমানে গোলাবর্ষণ চলেছে। কোথা থেকে যে ওরা এত গোলা পাচ্ছে সেইটেই একটা রহস্য।

আমরা অপেক্ষা করছি তো অপেক্ষাই করছি। দুপুরবেলা আমি যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই ঘটল। একজন রংরুটকে তড়কা রোগে ধরে। আমি তাকে বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি, সে থেকে থেকে দাঁত কড়মড় করছে, হাতের মুঠো বন্ধ করছে আর খুলছে। কয়েক ঘণ্টার মতো সে অবসন্ন হয়ে শান্ত হয়ে বসে ছিল। এখন সে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে মেঝের উপর দিয়ে চলতে থাকে। হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায়, তারপর সুট করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি—

"কোথায় যাচ্ছ?"

—"এখনি ফিরে আসছি"—বলে সে আমায় ঠেলে চলে যেতে চায়।

আমি বলি—"আর একটু অপেক্ষা কর, এখনই গোলাবৃষ্টি থেমে যাবে।"

সে শোনে, মুহূর্তের জন্যে তার দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসে। তারপর আবার ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো চোখ লাল হয়ে ওঠে; আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

আমি বলি—"একটু দাঁড়াও।" কাট্ দেখতে পেয়ে লাফিয়ে আসে—আমরা দুজনে গিয়ে তাকে চেপে ধরি।

তারপর সে প্রলাপ বকতে থাকে—"আমাকে ছেড়ে দাও! আমি বাইরে যাব, আমি বাইরে যাব!"

কোনোমতেই সে শুনবে না! সে ঘুষি ছুঁড়তে থাকে, তার মুখ ঘেমে ওঠে, বিড়বিড় করে প্রলাপ বকতে থাকে। এ রোগের নাম 'ক্লস্ট্রোফোবিয়া'। তার মনে হয় যে এখানে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কোনো রকমে তাকে বাইরে যেতেই হবে! একে যদি এখন ছেড়ে দেওয়া যায় তো এই গোলাবৃষ্টির মাঝে মাঠের মধ্যে যেখানে খুশি পাগলের মতো ছুটে বেড়াবে। এ অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম নয়। উপায় নেই—ওকে সজ্ঞান করবার জন্যে আমরা বেশ করে পিটুনি দিয়েছি। আমরা নিষ্ঠুর ভাবে মেরেছি—একটুও ইতস্তত করিনি। শেষে ও শান্ত হয়ে বসে। দেখি, বাকি ক'টা নতুন রংরুটের মুখ শাদা হয়ে গেছে। ও বেচারাদের পক্ষে এই ভীষণ গোলাবর্ষণ সহ্য করা মুশকিল। এদের রংরুটের ঘাঁটির থেকে সোজা এইখানে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো হয়নি। এই বারাজ্-এ ঘাগী সেপাইদের মাথার চুল শাদা হয়ে যায় তো—এরা!

তারপর এই চটচটে সোঁদা বন্ধ আবহাওয়া যেন ক্রমেই আমাদের বুক চেপে ধরতে থাকে! মনে হয় আমরা যেন আমাদের কবরের মধ্যে কেবল মাটি চাপা পড়বার অপেক্ষায় আছি।

হঠাৎ একটা ভীষণ গর্জ্জন আর কি যেন ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে। গোফার ছাদের উপর সোজাসুজি একটা গোলা নেমে পড়েছে ; থর্ থর্ করে সারা ঘরখানা কেঁপে ওঠে! গোফাটার থিলে থিলে চড়্চড়্ করে ফাট ধরে! ভাগ্য ভালো যে একটা ছোটো গোলা—কংক্রিটের ছাদ উড়িয়ে দিতে পারেনি। দেয়ালগুলো টল্মল্ করে ওঠে, চারিদিকে রাইফ্ল্ আর লোহার টোপ্ ঝন্ঝন্ করে ওঠে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়, গন্ধকের ধোঁয়ায় ঘর ভরে ওঠে।

এই গভীর গোফাটার বদলে আজকাল নতুন যে ছোটো ছোটো গোফা তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে যদি আমরা থাকতুম, আমাদের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যেত না।

কিন্তু ফল বড় ভালো হচ্ছে না। সেই নতুন সৈনিকটা আবার প্রলাপ বকতে শুরু করেছে, আরও দুজন দেখাদেখি তাই বিড়্বিড়্ করতে থাকে। কয়েকজন লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়, অন্য দুজনকে নিয়েও আমরা বিপদে পড়ি। একজন ছুটে বেরিয়ে যায়, আমি তার পিছনে ছুটি ; একবার ভাবি ওর পায়ে গুলি করি—ঠিক এই সময় একটা বজ্রপাতের মতো শব্দ হয়, আমি সটান হয়ে শুয়ে পড়ি ; যখন উঠে দাঁড়াই, দেখি যে ধ্বসে-যাওয়া ট্রেঞ্চের দেওয়ালের গায়ে মাংসপিণ্ডে, গুলির টুকরোয় আর পোশাকের কুঁচিতে এক হয়ে গেঁথে রয়েছে। আমি ছুট্তে ছুট্তে পালিয়ে যাই।

সেই প্রথম সৈনিকটাকে দেখে মনে হয় সে সত্যিই পাগল হযে গেছে। সে ছাগলের মতো দেওয়ালের গায়ে মাথা গুঁতোতে থাকে। আজই ওকে আমরা পিছনের শ্রেণীতে সরিয়ে নিযে যাবার চেষ্টা করব। এখনকার মতো আমরা ওকে বেঁধে রেখে দি ; এমন ভাবে বাঁধি যে আক্রমণ এসে পড়লে চট করে খুলে দিতে পারব।

কাট্ বলে—"এসো এক হাত স্ক্যাট্ খেলা যাক—কিছু কাজ হাতে

থাকলে তবু একটু আরাম পাওয়া যাবে।” কিন্তু কিছু লাভ হল না। প্রত্যেকটি গোলা-ফাটার শব্দ আমরা কান খাড়া করে শুনছি আর দান ফেলতে ভুল করে ফেলছি। শেষে খেলা ছেড়ে দিতে হয়।

আবার আসে রাত্রি। শ্রান্তিতে আমরা যেন মড়ার মতো হয়ে যাই। আমাদের দেহে যেন মাংসও নেই, পেশীও নেই; পাছে কিছু একটা কল্পনাতীত ভয়ানক দেখে ফেলি এই ভয়ে কেউ কারও মুখের দিকে তাকাই না। আমরা দাঁতে খিল্ লাগিয়ে বসে থাকি আর ভাবি—এরও শেষ আছে—এ শেষ হবেই—বিপদ-সাগর পার হয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব।

হঠাৎ নিকটের গোলাবর্ষণ থেমে যায়। গোলাফাটার শব্দ আসে, কিন্তু তারা আমাদের টপকে পিছন দিকে পড়েছে। আমাদের ট্রেঞ্চটা খোলসা হয়ে গেছে। আমরা আমাদের বোমাগুলো মুঠিয়ে ধরে গোফার বাইরে ছুড়তে ছুড়তে বার হই। গোলাবর্ষণ থেমে গেছে। আমাদের পিছনে এখন ঘন ‘বারাজ’ শুরু হয়ে গেছে। আক্রমণ এসে পড়েছে।

এই ভীষণ ধ্বংসলীলার মধ্যে যে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তবু দেখি ট্রেঞ্চের চারিদিকে ইস্পাতের টোপ উকি মারতে লাগল। আমাদের পাশে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা মেশিনগান গাড়া হয়েছে, সেটাও গর্জে উঠল।

কাঁটাতারের যে বেড়া ছিল তা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুকরো হয়ে গেছে। তবু তাতে কিছু বাধা দেবে। দেখতে পেলুম আক্রমণকারী শত্রুসৈন্য আসছে। আমাদের কামানের শ্রেণী গোলা ছুড়তে থাকে, মেশিন গানের ঝঞ্ঝনা জেগে ওঠে, রাইফ্‌ল্‌গুলো গর্জন করতে থাকে। আক্রমণ এগিয়েই আসে।

ভেস্টুস আর ক্রোপ হাত বোমা ছুঁড়তে আরম্ভ করে; আমরা তাদের হাতে বোমা যুগিয়ে চলি; যত তাড়াতাড়ি পারে তারা ছুঁড়তে থাকে;

ভেস্টুস পঁচাত্তর গজ ছুঁড়তে পারে আর ক্রোপ্ পারে ষাট—ওটা মাপা আছে, কারণ এই দূরত্বটা জানা বিশেষ দরকার শত্রু যখন ছুটে আসে, চল্লিশ গজের মধ্যে আসবার আগে তারা কিছুই করতে পারে না।

বিকৃত মুখ আর মসৃণ শিরস্ত্রাণ দেখে চিনতে পারি এরা ফরাসি সৈন্য। আমাদের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে পৌঁছতেই তাদের অনেক লোকক্ষয় হয়ে গেছে। একটা গোটা লাইন আমাদের মেশিন-গানগুলোর সামনে সাবাড় হয়ে গেল। তারপর আমাদের খানিকটা বাধা পড়ে, বিপক্ষেরা আরও খানিক এগিয়ে আসে।

আমি দেখতে পাই তাদের একজন আকাশের দিকে মুখ করে তারের বেড়ার উপর গিয়ে পড়ে। তার দেহ অসাড় হয়ে যায়। কিন্তু হাত দুটো কাঁটাতারের গায়ে ঝুলতে থাকে—সে যেন উঁচু হাত করে প্রার্থনা করছে। তারপর দেহ যায় উড়ে, কেবল হাত দুটো আগেরই মতো বেড়ার গায়ে লট্‌পট্ করতে থাকে।

ঠিক যে সময়ে আমরা পিছনে হটে যাব, মাটির মধ্যে থেকে তিন মূর্তি আমার সামনে উঠে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজনের দুটো চোখ কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চক্‌চকে লোহার টোপের তলায় একটা ছুঁচোলা দাড়ি আর একজোড়া চোখ! আমি আমার হাত তুললুম—কিন্তু ঐ অচেনা চোখ-দুটোর উপর আমার বোমা ছুঁড়তে পারলুম না; সমস্ত হত্যাকাণ্ডটা যেন আমার মাথার চারিদিকে বোঁ বোঁ করে ঘুরে গেল; কেবল এই দুটো চোখ স্থির নিষ্পন্দ। তারপর মাথাটা উঁচু হয়; একখানা হাত নড়ে ওঠে; বাতাসের মধ্য দিয়ে ছুটে আমার হাত-বোমাটা তার উপর গিয়ে পড়ে।

আমরা পিছনের শ্রেণীতে দৌড় মারি। পালাবার আগে কাঁটাতারের তাকগুলো ট্রেঞ্চে ফেলে আসি; পথে বোমা ছড়িয়ে রেখে আসি। পিছন থেকে আমাদের মেশিন্-গান্ ইতিমধ্যেই গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

আমরা এখন বুনো জানোয়ারের মতো হয়ে পড়েছি। আমরা যুদ্ধ করি না, কেবল ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষা করি। আমরা বোমা ছুঁড়ে মারছি; মানুষকে লক্ষ্য করে নয়। মৃত্যু স্বয়ং যখন লোহার টোপ্ পরে হাত বাড়িয়ে আমাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে তখন মানুষের আমরা কি তোয়াক্কা রাখি! আজ তিন দিন পরে এই প্রথম মৃত্যুদূতের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছে, আজ এই প্রথম তাকে আমারা স্পর্শ করতে পেরেছি, তাকে আমরা বাধা দিতে পেরেছি। আর আমরা অসহায়ের মতো মৃত্যুদণ্ডের হুকুম শোনবার জন্যে পড়ে নেই। এখন আমরাও ধ্বংস করতে পারি, আত্মরক্ষা করতে পারি, প্রতিশোধ নিতে পারি।

আমরা প্রত্যেকটি কোণে গুড়ি মেরে প্রত্যেকটি বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে অগ্রগামী শত্রুর দিকে মুঠো মুঠো বোমা ছুঁড়ে মারি। বেড়ালের মতো গুড়ি মেরে আমরা ছুটতে থাকি। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো দলের পর দল শত্রু আসছে, আমরা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো হয়ে উঠেছি, আমরা ঠেঙাড়ে, খুনে, শয়তান হয়ে উঠেছি। ভয়ে উন্মত্ততায়, জীবনের লালসায় আমাদের শক্তি হাজারগুণ বেড়ে গেছে, সেই শক্তি দিয়ে আমরা লড়াই করছি কেবল আমাদের নিজেদের বাঁচবার জন্যে। যদি তোমার নিজের পিতাও ওদের সঙ্গে আসেন, তাঁর দিকে একটা বোমা ছুড়ে দিতে তুমি একটুও ইতস্তত করবে না।

সামনের ট্রেঞ্চগুলো আমরা ছেড়ে এসেছি। ওগুলোকে আর ট্রেঞ্চ বলা চলে না। সমস্ত ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—কেবল এখানে ওখানে ট্রেঞ্চের টুকরো, হাজারে হাজারে গর্ত, খানাখন্দ—এই বাকি আছে। কিন্তু শত্রুদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে। আমাদের দিক থেকে এতটা যে বাধা পাবে তা ওরা আশা করেনি।

প্রায় বেলা দুপুর হয়েছে। সূর্য প্রখর হয়ে ওঠে। আমাদের কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে চোখে এসে পড়তে থাকে। জামার হাতায় করে ঘাম মুছি, তার সঙ্গে রক্তও আসে। অবশেষে ওরই মধ্যে একটা ভালো রকম ট্রেঞ্চে এসে পৌঁছই। এখানে আমাদের দিক থেকে প্রত্যাক্রমণের জন্যে সব তৈরি রাখা হয়েছে। এই ট্রেঞ্চে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের সমস্ত কামান এক সঙ্গে ছোঁড়া শুরু হয়—শত্রুদের আক্রমণ-চেষ্টা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের দিকে যারা তেড়ে আসছিল তারা আর এগুতে পারে না। আমরা তৈরি হয়ে থাকি। যেমন দেখি আমাদের কামানের মুখ উঁচু করে আরও একশো গজ পাল্লা বাড়িয়ে দেওয়া হল, সেই সঙ্গে আমরাও এগুতে থাকি। আমার পাশেই একজন লান্স্ কর্পোরালের মাথাটা ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে গেল, তার কাটা গলা দিয়ে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ছুটতে থাকল। সেই অবস্থাতেই তার স্কন্ধকাটা ধড়টা দু'চার পা ছুটে গেল।

শত্রুরা হটে গেছে। হাতাহাতি লড়াই আর হল না। আমরা আবার এসে আমাদের খণ্ডবিখণ্ড ট্রেঞ্চে পৌঁছলুম; সেটাও পেরিয়ে গেলুম। হায় রে, আবার এই ফিরে আসা! ট্রেঞ্চের ভিতরকার আশ্রয়গুলো দেখে বড়ো লোভ হয় ঐখানে গুড়ি মেরে লুকিয়ে বসে থাকি—কিন্তু তা হবার নয়, এই বিভীষিকার মধ্যে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যদি আমরা যন্ত্রচালিতের মতো না হতুম তো অবসন্ন দেহমন নিয়ে ঐ মাটির মধ্যে লুকিয়ে পড়তুম। আমাদের আর শক্তি নেই, তবু কিসে যেন আমাদের উন্মত্ত ক্রুদ্ধ করে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। আমরা মারব—কারণ ওরা এখনও আমাদের মারাত্মক শত্রু। ওদের বন্দুক, ওদের বোমার লক্ষ্য আমাদের দিকে; আমরা যদি ওদের ধ্বংস না করি, ওরা আমাদের ধ্বংস করবে।

আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। টাল খেতে খেতে লাফ

দিয়ে আমরা চলেছি। আহত ছিন্নভিন্ন সৈনিকেরা মাটির উপর পড়ে রয়েছে, তারা চীৎকার করে কেঁদে আমাদের পা জড়িয়ে ধরতে চায়—কিন্তু উপায় নেই—আমরা তাদের ডিঙিয়ে চলে যাই।

পরের জন্যে সহানুভূতি আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছি। যখনই আমাদের চোখে অপর একজন মানুষের মূর্তি পড়ে আমরা নিজেকে সংযত করতে পারি না। আমাদের আর চেতনা নেই, যেন মরে গেছি, তবু যেন কোন যাদুমন্ত্রে এখনও আমরা ছুটতে পারি আর পারি হত্যা করতে।

একজন তরুণ ফরাসী সৈনিক পিছিয়ে পড়েছিল, সে ধরা পড়ল; সে ভয়ে তার হাত লুকিয়ে ফেলে, এক হাতে তখনও সে পিস্তল ধরে আছে—ও কি গুলি করতে চায়? না, ধরা দিতে চায়?—একটা কোদালের ঘায়ে তার মুখ দু'ফাঁক হয়ে যায়—দ্বিতীয় একজন এই দেখে ছুটে পালাতে যায়—তার পিঠের মধ্যে একটা সঙিন প্রবেশ করে। সে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে করতে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। তৃতীয় একজন বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়ে। তাকে বন্দী করে পিছনে রেখে যাওয়া হয়—আহতদের বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে হঠাৎ আমরা শত্রুদের লাইনে এসে পৌঁছই।

পলাতক শত্রুদের এত পায়ে-পায়ে আমরা অনুসরণ করে যাই যে তারা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পৌঁছই। কাজেই শত্রুরা ভালো করে মেশিন-গান্ ছোঁড়বার সুযোগ পায় না। আমাদের সৈনিকেরা খুব কমই মারা পড়ে। শত্রুদের একটা মেশিন-গান্ গর্জে ওঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোমার ঘায়ে সেটা স্তব্ধ হয়ে যায়। তা হলেও দু সেকেণ্ডেই আমাদের দলের পাঁচজনের পেটে গুলি

লেগে যায়। কাট্‌ তার বন্দুকের কুঁদোয় করে একজন অনাহুত মেশিন-গান্‌-ওয়ালার মুখ থেঁতো করে দেয়। আর যারা ছিল তারা বোমা বার করবার আগেই আমাদের সঙিনে গাঁথা হয়ে যায়। তারা মেশিন-গান্‌ ঠাণ্ডা করবার জন্যে যে জল রেখেছিল আমরা প্রাণ ভরে খেয়ে নি।

কাঁটার বেড়ার উপর কাঠের তক্তা ফেলে আমরা ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়ি। ভেস্ট্‌ুস্‌ একজন বিরাটকায় ফরাসির ঘাড়ে কোদালির এক কোপ দেয়, তারপর হাতবোমা ছোঁড়ে। আমরা একটা ছোটো প্রাচীরের আড়ালে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে গা-ঢাকা দিই, তারপরই আমাদের সামনে ট্রেঞ্চের সমস্ত অংশটা খালি হয়ে যায়। আর একটা বোমা ছুঁড়ে, যাবার একটা রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলি। আমরা ছুটে যাবার সময় গোফার মধ্যে কয়েকটা করে বোমা ফেলে দিয়ে চলে যাই। মাটি কেঁপে ওঠে, বোমা ফাটার শব্দ যেন চাপা পড়ে যায়। থল্‌থলে মাংসের স্তূপের উপর আমরা পা পিছলে পড়তে থাকি। আমি একটা ফাঁসা পেটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই—দেখি পেটটার উপর একটা পরিষ্কার তক্‌তকে নতুন অফিসারের টুপি।

যুদ্ধ থেমে যায়। শত্রুদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়। এখানে আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারব না; আমাদের গোলাবর্ষণের আড়াল দিয়ে আমাদের নিজের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। যেই এ কথা মাথায় এল, সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি যে গোফা পেলুম তার মধ্যে আমরা ঢুকে পড়লুম তারপর তাড়াতাড়ি যা কিছু খাবার হাতের কাছে পেলুম তুলে নিলুম, বিশেষত কর্নড্‌ বিফ্‌ এবং মাখন।

বেশ নিরাপদেই আমরা ফিরে আড্ডায় পৌঁছই। শত্রুর তরফ থেকে আর আক্রমণ আসে না। পুরো এক ঘণ্টা কারও মুখে আর কথাও নেই, সকলেই জিরোতে থাকে। আমরা এত শ্রান্ত হয়েছি যে, প্রচণ্ড

খিদে পাওয়াতেও কেউ খাবার কথা ভাবিনে। তারপর ক্রমে ক্রমে আমরা আবার মানুষের মতো হই।

সারা ফ্রন্ট জুড়ে শত্রুদের এই কর্নড্ বিফ-এর খুব খ্যাতি। কখনও প্রধানত এরই জন্যে আমরা আক্রমণ করতে করতে শত্রুদের ঘাঁটি অবধি ধেয়ে যাই। কারণ আমাদের খাবার-দাবার সাধারণত অতি বিশ্রী; এবং আমাদের খিদে চিরস্থায়ী।

সবশুদ্ধ পাঁচটা টিন আমরা যোগাড় করেছি। ওদের লোকেরা বেশ যত্ন পায়। আমাদেব এই খিদের যন্ত্রণা, শালগমের চাটনি আর একটুখানি করে মাংসের টুকরোর কাছে এটা যেন বিরাট ভোজের মতো লাগে—আমরা তাই খেতে কাড়াকাড়ি লাগিযে দিই। ভেস্টুস একটা শাদা ফরাসী পাউরুটি তার পেটিতে কোদালির মতো গুঁজে রেখেছে। এক কোণে একটু রক্ত লেগে গেছে—সেটা কেটে বাদ দেওযা যেতে পারে।

তবু ভালো আমরা শেষটায কিছু ভদ্রবকম খাবাব খেতে পেলুম; এখনও আমাদেব শবীরে বলসঞ্চযের প্রযোজন আছে—একটা ভালো গোফা আমাদেব কাছে যতখানি দরকারি, যথেষ্ট খেতে পাওযাও তাই। দুইযেতেই আমাদের জীবন রক্ষা হয; সেই কারণেই আমাদের খাবারের লোভ এত বেশি।

ইয়াডেন পুরো দু'বোতল ক্যানিয়াক্ যোগাড় করেছে। সে দুটোকে আমরা ভাগাভাগি করে পার করি।

সন্ধ্যার আশীর্বাদ বর্ষিত হতে শুরু হয়। রাত্রি আসে, খানা-ডোবার মধ্যে থেকে একটা ঘন কুয়াশা জেগে উঠতে থাকে। দেখে মনে হয় যেন প্রেতলোকের কতই না রহস্য খানা-ডোবাগুলোতে ভরা রয়েছে।

গা শীত শীত করে। আমি পাহারায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকি। আক্রমণেব পর বরাবর যেমন হয়ে থাকে, আমার দেহ-মনে আর শক্তি যেন নেই! আপন মনে যে কিছু ভাববো তারও ক্ষমতা নেই!

প্যারাসুটের আলো আকাশে উঠতে থাকে। আমার হাত যেন হিম হয়ে আসে, গা শিব্ শির্ করতে থাকে। রাত্রিটা যে খুব ঠাণ্ডা তা নয়, কেবল এই হিম কুয়াশাটাই ভারি ঠাণ্ডা। এই রহস্যময় হিম কুয়াশা— এ যেন মরা মানুষগুলোর গা থেকে উঠে ধীরে ধীরে বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, তাদের বুক থেকে জীবনের অবশেষটুকু পর্যন্ত শুষে নিচ্ছে। কোথা থেকে যেন খাবারের টিনের ঠন্‌ঠন্ শব্দ আসছে শুনতে পাই; সঙ্গে সঙ্গে গরম খাবারের জন্যে বড়ো ইচ্ছা জাগে। পাহারা বদলের সময়টুকু কোনোমতে অপেক্ষা করে কাটাই।

তারপর গোফায ফিরে গিয়ে এক ভাঁড় চর্বিতে ভাজা যব পাই। খেতে বেশ লাগে, আস্তে আস্তে সবটা খেয়ে ফেলি। গোলাবর্ষণ থেমে গেছে বলে সকলে বেশ একটু ফূর্তিতে আছে।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কেটে যায়। একবার আক্রমণ, একবার প্রত্যাক্রমণ, ক্রমে ক্রমে মৃতদেহে মাঠের গর্তগুলো ভরে উঠতে থাকে। অধিকাংশ আহত, যারা বেশি দূরে পড়ে নেই তাদের আমরা নিয়ে আসতে পারি; কিন্তু অনেককেই বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হয়, আর আমরা বসে বসে শুনতে পাই তিলে তিলে যারা মরছে তাদের গোঙানি।

যখন আমাদের দিকে বাতাস বয়, বাতাসের সঙ্গে রক্তের গন্ধ ভেসে আসে, চাপ চাপ রক্তের একটা মোদো গন্ধ, এই পচা গন্ধে আমাদের গা যেন ঘুলিয়ে আসে।

একদিন সকালবেলা আমাদের ট্রেঞ্চের সামনে দুটি প্রজাপতি খেলা করে বেড়াচ্ছে। হলুদবর্ণ দুটি প্রজাপতি—ডানায় তাদের লাল ফোঁটা—এদের বলে গন্ধপাষাণী প্রজাপতি। কিসের সন্ধানে তারা এখানে এসেছে কে জানে! কয়েক ক্রোশের মধ্যে গাছও নেই, ফুলও নেই। একটা মড়ার মাথার দাঁতের পাটির উপর তারা দুটিতে স্থির হয়ে বসল।

এখানকার পাখিগুলিও বেশ নির্ভয়। অনেক দিন ধরে আমাদের যুদ্ধ তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। প্রতিদিন সকালে ঐ 'নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড' থেকে ভারুই পাখি আকাশে উড়ে যায়! এক বছর আগে তাদের আমরা বাসা গড়তে দেখেছি; বাচ্চাগুলোও দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠল।

কিছুদিনের জন্যে ইঁদুরগুলোর হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছি! ওরা গেছে ঐ বেওয়ারিশ জমিতে, তার কারণও আমরা জানি—তারা মড়া খেয়ে মোটা হতে গেছে। তাদের দেখি আর আমরা মার দিই। রাত্রিবেলা শত্রুশ্রেণীর পিছনে আবার সেই ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা যায়। সারাদিন অল্পস্বল্প গোলাবর্ষণ চলে, কাজেই আমরা ট্রেঞ্চ মেরামত করবার সুবিধে পেয়ে যাই।

লড়িয়ে উড়োজাহাজগুলো আমাদের বেশি জ্বালাতন করে না, কিন্তু ঐ পর্যবেক্ষণের উড়োজাহাজগুলোকে আমরা দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। আমরা কোথায় আছি না-আছি ওরা গিয়ে খবর দেয়। ওরা আসবার দু'মিনিট পরেই আমাদের উপর শ্র্যাপ্‌নেল্‌ আর বড়ো গোলা এসে পড়তে থাকে। এমনি করে একদিন আমাদের এগারোজন লোক মারা পড়েছে, তার মধ্যে পাঁচজন স্ট্রেচার-বাহক। দুজনের দেহ এমন থেঁৎলে গিয়েছিল যে ইয়াডেন তামাশা করে বললে যে দেয়ালের গা থেকে চাম্‌চে করে তুলে ওদের এখন খাবারের টিনে

ভরা চলে। আর একজনের কোমর থেকে পা পর্যন্ত আধখানা দেহ ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ট্রেঞ্চের গায়ে সে ছিটকে পড়ল। তার মুখ হলদে হয়ে গেছে, ঠোঁটে তখনও একটা জলন্ত সিগারেট।

হঠাৎ আবার গোলাবৃষ্টি শুরু হয়। আমরা দুশ্চিন্তার উদ্বেগে উঠে বসি। আক্রমণ, প্রত্যাক্রমণ, ধাবন, প্রত্যাবর্তন—এই সমস্ত কথা, কিন্তু এদের অর্থ কি! আমরা অনেক লোক হারিয়েছি, অধিকাংশই রংরুট। আমাদের দল পূরণ করবার জন্যে নতুন সৈন্য পাঠানো হয়েছে। এরা একেবারে আনকোরা সেনাদল, অল্পবয়সের ছেলেদের দিয়ে গড়া, সবে গেল-বছর তারা দলে ভিড়েছে; সামরিক শিক্ষা পায়নি বললেই চলে—কেবল অনুমান-মূলক জ্ঞান নিয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে। হাত-বোমা কাকে বলে তা তারা জানে একথা ঠিক, কিন্তু আড়াল কাকে বলে তাদের কোনো ধারণাই নেই; বিশেষত যেটা আরও দরকার—আড়াল খুঁজে বার করবার চোখ—তাই তাদের নেই। মাটির গায়ে যদি একটা খাঁজ থাকে, তো অন্তত তা আঠারো ইঞ্চি উঁচু না হলে তাদের চোখেই পড়বে না।
যদিও নতুন সৈন্যের আমাদের দরকার আছে, কিন্তু রংরুটদেব কাছ থেকে আমরা কাজ যত পাই ঝঞ্চাট পাই তার চেয়ে বেশি। এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে তারা মাছির মতো পালে পালে মারা পড়ে। আজকালকার এই ঘাঁটি থেকে যুদ্ধের প্রথায় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার দরকার খুব বেশি। আজকালকার দিনে যা দরকার তা হচ্ছে মাটির গায়ে প্রত্যেকটি খাঁজ-টাঁজ এক পলকে চিনে নেবার চোখ; প্রত্যেক বিভিন্ন রকমের গোলার শব্দ চেনবার কান; কোথায় সে গোলা পড়বে,

কেমন করে ফাটবে, এবং কি উপায়ে তা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে তা চট্ করে স্থির করবার আন্দাজ।
বাচ্চা রংরুটেরা এর কিছুই জানে না। তারা মারা পড়ে, তার কারণ স্র্যাপ্‌নেল্‌-এর সঙ্গে বড়ো গোলার শব্দের পার্থক্য ধরতে পারে না ; তারা দলে দলে ধ্বংস হয়, তার কারণ, কোথায় পিছনে বহুদূরে বড়ো বড়ো গোলা ফাটার শব্দ আসছে সেই দিকে তারা কান পেতে থাকে, এদিকে ছোটো গুলির দিকে তাদের কোনো হুঁস নেই। চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে তাই তারা ভেড়ার মতো এক জায়গায় জড়াজড়ি করে, এমন কি আহতরাও উড়োজাহাজ চালকের হাতে খরগোসের মতো মারা পড়ে।

ট্রেঞ্চের এক অংশে হঠাৎ হিমেলস্টোশের সঙ্গে আমার দেখা। আমরা দুজনেই একটা গোফায় প্রবেশ করলাম। দম বন্ধ করে আমরা সকলে বসে আছি—কখন আক্রমণ হবে তারই প্রতীক্ষায়।
যখন আমাদের বেরুবার সময় এল, সেই উত্তেজনার মুখে হঠাৎ আমার মনে হল—"হিমেলস্টোশ কোথায় ?" গোফার মধ্যে এক লাফে প্রবেশ করে দেখলুম আহতের মতো ভান করে এক কোণে সে পড়ে রয়েছে। তার মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন, ভীষণ ভয় পেয়েছে। এটা তার পক্ষেও নতুন বটে, কিন্তু বাচ্চা রংরুটরা বাইরে যাবে, আর সে এখানে আরামে শুয়ে থাকবে এ দৃশ্য আমার অসহ্য হল।
আমি বললুম—"বেরিয়ে যাও।"
সে নড়ে না, তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে, গোঁফ কুঞ্চিত হয় !
—"বেরোও !"
সে পা গুটিয়ে নিয়ে দেয়ালের গায়ে গুড়ি মেরে বসে খেঁকি কুকুরের মতো দাঁত খিঁচোতে থাকে।

আমি তার হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করি, সে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠে!

আমার আর সহ্য হয় না। আমি তার টুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলি—"জড়পিণ্ড কোথাকার—বেরো বলছি! কুকুর কোথাকার—কুকুরের অধম—বেরোবি কি না।" দেয়ালে তার মাথা ঠুকতে থাকি—"গোরু কোথাকার!" পাঁজরে লাথি লাগিয়ে বলি—"শূয়োর কোথাকার!" তাকে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে যাই।

আমাদের আক্রমণের আর একটা তরঙ্গ এসে পৌঁচেছে। তাদের সঙ্গে একজন লেফ্‌টেনেণ্ট। তিনি আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—"এগোও, এগোও, দলে যোগ দাও, এসো—"

আমার এত মার-ধরেও যা হয়নি, এক হুকুমে তাই হয়ে যায়। হিমেলস্টোশ আদেশ শুনতে পায়, চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে—যেন জেগে উঠেছে, তারপর লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ে!

আমি তার পিছনে পিছনে লক্ষ্য রেখে চলি। আবার সে সেই কুচ্‌কাওয়াজের মাঠের চটপটে হিমেলস্টোশ, সে লেফ্‌টেনেণ্টকেও ছাড়িয়ে বহুদূরে এসে গেছে।

যে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম পাই আমরা নতুন রংরুটদের শিক্ষিত করি—"ঐ যে লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে একটা জিনিস আসছে দেখছ? ওটা একটা মর্টার—নিচু হয়ে থাক, পরিষ্কার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে! কিন্তু যদি এ দিকে আসতে থাকে তো দৌড় দেবে। মর্টারের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচা অসম্ভব নয়।"

তাদের কানকে আমরা ছোটো গোলার অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি—যার শব্দ সহজে কানে পৌঁছায় না—তার প্রতি সচেতন করে তুলি। আমরা বুঝিয়ে দি, বড়ো গোলার শব্দ দূর থেকে পাওয়া যায়, এই ছোটো গোলাগুলিই বেশি বিপজ্জনক।

এরোপ্লেনে তাড়া করলে কেমন করে আড়ালে যেতে হয়, কেমন করে মরার ভান করতে হয়, কেমন করে হাত-বোমা ছুঁড়লে মাটিতে পড়বার ঠিক আধ সেকেণ্ড আগে ফাটে, এই সব আমরা তাদের শেখাই। কেমন করে বিদ্যুদ্বেগে গাড়ার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হয়, কেমন করে এক মুঠো বোমার সাহায্যে একটা ট্রেঞ্চ পরিষ্কার করে ফেলা যায় এই সব শেখাই। গ্যাসের বোমার শব্দ কেমন তাদের শিখিয়ে দি; মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার সব রকম কায়দা-কানুন তাদের শিখিয়ে দি।

তারা শোনে, তারা বেশ শিক্ষা-প্রবণ—কিন্তু যখনই বিপদ শুরু হয়, উত্তেজনার মুখে তারা সব ভুল করে বসে।

ভেস্টুস পিঠে একটা মস্ত বড়ো ক্ষত নিয়ে মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে আসে। প্রতিবার শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সেই ক্ষত দিয়ে তার ফুস্‌ফুস্ বার হয়ে পড়ছে। সে গোঙিয়ে ওঠে—"হয়ে গেছে পাউল।" যন্ত্রণায় সে হাত কামড়াতে থাকে।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখে দেখে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি, মাথার খুলি উড়ে গেছে কিন্তু তখনও মানুষটা বেঁচে আছে। দু'পা কাটা মানুষকে আমরা দৌড়তে দেখেছি। একজন লান্স কর্পোরালকে থেঁৎলানো হাঁটু টানতে টানতে এক হাতে ভর করে দেড় মাইল হেঁচড়ে যেতে দেখেছি। একজনকে ফাটা পেটের মধ্যে দিয়ে ঝুলে-পড়া নাড়িভুঁড়ি দু'হাতে করে ধরে হাসপাতাল অবধি হেঁটে যেতে দেখেছি। আমরা মুখ-হীন, মুখমণ্ডল-হীন, থুঁৎনি-ভাঙা মানুষ দেখেছি। আমরা এমন লোক দেখেছি যে পাছে রক্তপাতে মারা যায় এই ভয়ে পুরো দু'ঘণ্টা হাতের একটা শির দাঁতে টিপে ধরে আছে! সূর্য ডুবে যায়, রাত্রি আসে, জীবন যেন শেষ হয়ে গেছে। এত হাঙ্গামা-হুজ্জতের পরেও আমরা যে মাটিটুকুর উপর শুয়ে আছি

তার দখল ছাড়িনি। শত্রুরা মাত্র কয়েক শ' গজ দখল করতে পেরেছে, 'তার প্রতি গজের জন্যে অন্তত একজন করে প্রাণ দিয়ে এসেছে।'

আমরা পালা বদল করে ছুটি পেয়েছি। গাড়িতে করে আমরা ফিরে চলি, পায়ের তলায় চাকার ঘর্ঘর—আমরা একভাবে দাঁড়িয়ে আছি! যেই ডাক শুনেছি—"তার, খবরদার—" আমাদের হাঁটু কুঁক্‌ড়ে যাচ্ছে। যখন আমরা এসেছিলুম তখনও গ্রীষ্মকাল ফুরোয়নি, গাছপালা তখনও সবুজ ছিল; এখন হেমন্ত এসেছে, ধূসর হিমাচ্ছন্ন রাত্রি। লরি থামতে আমরা নেমে পড়ি। দু'পাশ থেকে সেনাদলের আর কোম্পানির নম্বর হেঁকে যায়। প্রত্যেক হাঁকে এক এক দল আলাদা হয়ে সরে দাঁড়ায়। সামান্য কয়েকটি ধুলোকাদা-মাখা রক্তহীন সৈনিক—যে ক'জন বাকি আছে, নিতান্তই সামান্য।

কে একজন আমাদের কোম্পানির নম্বর ডাকছে; হ্যাঁ আমাদের কোম্পানির কমাণ্ডাই বটে, ওঁরও চোট লেগেছে দেখছি—হাতটা ফেটিতে ঝুলছে। আমরা তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। আমি, কাট্ আর আলবের্ট এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই।

আমরা শুনতে পাই আমাদের কোম্পানির নম্বর বার বার ডাকা হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে ডেকেই চলল—কিন্তু আমাদের দলের অধিকাংশই যে যমের বাড়ি কিংবা হাসপাতালে—তাদের কানে ডাক গিয়ে পৌঁছয় না। আবার একবার—"সেকেণ্ড কোম্পানি, এই দিকে!"

তারপর আর একটু নরম সুরে—"সেকেণ্ড কোম্পানির আর কেউ নেই?"

তিনি চুপ করেন, তারপর কর্কশভাবে বলেন—"এই কি সব?"

আদেশ দেন—"সংখ্যা বলো।"

ক্লান্ত সুর হেঁকে যায়—এক—দুই—তিন—চার···বত্রিশে গিয়ে থেমে যায়। অনেকক্ষণ চুপ থেকে আবার প্রশ্ন হয়—"আর কেউ?" একটু অপেক্ষা করে তারপর হুকুম আসে—"সেকেণ্ড কোম্পানি, সহজ ভাবে হেঁটে চল।"

সকালবেলা; একসার মানুষ—ছোট্ট একসারি লোক পা ফেলতে ফেলতে চলে যায়।

বত্রিশ জন লোক।
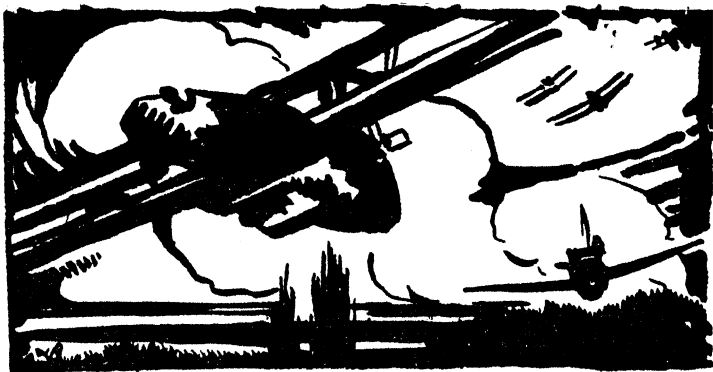
সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমাদের দলকে পুনর্গঠিত করবার জন্যে অনেক পিছনের এক মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের কোম্পানিতে এখন একশোজনের উপর লোক দরকার। যখন আমরা ছুটি পাই, চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। দু'দিন পরে হিমেলস্টোশ আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। ট্রেঞ্চে যাবার পর থেকে তার দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে, সে এখন আমাদের সঙ্গে ভাব করতে চায়। আমারও আপত্তি নেই, কারণ আমি দেখছি হাইএ ভেস্টুসের পিঠে যখন চোট লাগে, কেমন করে হিমেলস্টোশ তাকে নিয়ে এসেছিল। তা ছাড়া খাবারের দোকানে আমাদের পকেট খালি হয়ে গেলে সে আমাদের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেছে। কেবল ইয়াডেন এখনও সন্দিগ্ধ, সে নিজেকে তফাতে রাখে। কিন্তু শেষটা হিমেলস্টোশ ইয়াডেনেরও অন্তর জয় করে। হিমেলস্টোশ বলে যে বড়ো-বাবুর্চি ছুটিতে চলে গেছে, সে তার জায়গায় কাজ করবে। প্রমাণ স্বরূপ সে আমাদের জন্যে দু-পাউণ্ড চিনি আর বিশেষ করে ইয়াডেনের জন্যে আধ পাউণ্ড মাখন বার করে। সে এ বন্দোবস্তও করে দেয়, যাতে আমরা তিন-চার দিনের জন্যে রান্নাঘরে আলু আর শালগমের

খোসা ছাড়ানোর কাজে নিযুক্ত হই। সেখানে ক'দিন সে আমাদের রাজভোগে রাখে।

একজন সৈনিকের সুখের জন্যে দুটো জিনিস দরকার—ভালো খাবার আর বিশ্রাম। কিছুদিনের জন্যে এ দুটোই আমরা উপভোগ করতে লাগলুম। ভেবে দেখতে গেলে এ কিছুই নয়; কিন্তু ঐ ভাবনা জিনিসটা আমরা এখন দূর করে দিয়েছি। কাল আমরা অগ্নিবর্ষণের তলায় ছিলুম, আজ হাসি ঠাট্টা আমোদ ফুর্তি করে বেড়াচ্ছি, সমস্ত দেশ রপটে ফিরছি, আগামী কাল হয়তো আবার ট্রেঞ্চে যেতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মাঠের মধ্যে রয়েছি, ফ্রন্ট্ লাইনের দিনগুলোর কথা আমাদের মনেই নেই, সেগুলো নোড়ার মতো আমাদের মধ্যে তলিয়ে গেছে। চোখ কান বুজে ভয় জিনিসটাকে অনায়াসে সহ্য করতে পারা যায়, কিন্তু ঐ নিয়ে ভাবতে গেলে বহুদিন আগেই আমরা ধ্বংস হয়ে যেতুম।

যখন ফ্রন্ট লাইনে যাই তখন আমরা যেমন হিংস্র পশু হয়ে যাই, যখন বিশ্রাম করি তখন আমরা হা-ঘরের মতো চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। এ ছাড়া আমাদের করবার কিছু নেই। যেমন করে হোক আমাদের বাঁচতে হবে। অযথা ভাবের উচ্ছ্বাসে নিজেদের ভারাক্রান্ত করে আমাদের কোনো লাভ নেই। শান্তির সময়ে এ-সব শোভা পায় কিন্তু লড়াইয়ের মাঠে এগুলোর কোনো দাম নেই। কেমেরিখ্ মারা গেছে, হাইএ ভেস্ট্‌হুস মৃত্যুশয্যায়, হান্স্ ক্রামের্-এর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেছে, মার্টেন্স তার দুটো পা-ই হারিয়েছে, মেইএর মারা গেছে, মাক্স্ মারা গেছে, বেইএর মারা গেছে, হেম্মেরলিঙ্গ্ মারা গেছে, একশো কুড়ি জন আহত হয়ে এখানে নানা জায়গায় পড়ে রয়েছে; কিন্তু তাতে আমাদের কি? আমরা তো এখনও বেঁচে আছি। যদি তাদের বাঁচানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হত তো দেখিয়ে দিতুম তাদের

জন্যে আমাদের দরদ কতখানি, তাদের জন্যে আমরা কতখানি আত্মত্যাগ করতে পারি।

আমাদের সঙ্গীরা মারা গেছে, আমাদের কিছু করবার হাত নেই। তারা বিশ্রাম লাভ করছে—কে জানে আমাদের ভাগ্যেই বা কি আছে? আমরা যতক্ষণ পারি আরাম করব, ঘুমব, খাব-দাব, তামাক ফুঁকব, মদ খাব—যাতে একটুও সময় না বৃথা যায়—জীবন বড়ো সঙ্কীর্ণ!

লোকে বলে আমরা নাকি সবই ভুলে যেতে পারি, আর তাই যাইও। আসলে কিন্তু ভুলিনি আমরা কিছুই। ফ্রন্টের বিভীষিকা যখন আমাদের উপর গাঢ় ছায়া বিস্তার করে, তার সম্বন্ধে আমরা কঠোর কর্কশ রকমের পরিহাস করি। যখন কেউ মারা যায় আমরা বলি, "লোকটা গন্দেছে।" এই রকম সব বিষয়েই। এমনি করে আমরা পাগল হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাই।

খবরের কাগজে সৈনিকদের কত ফুর্তির কথা ছাপা হয়—তারা লেখে ফ্রন্টে যাবার আগের দিন আমরা নৃত্যোৎসবের বন্দোবস্ত করি—এ সব বাজে! আমরা যে ঐ রকম করি তার কারণ প্রাণের স্ফূর্তি নয়; তার কারণ অমন ধারা না করলে আমরা হাড়গোড় ভাঙা 'দ' হয়ে যেতুম। এমনি করে জোর করে ফুর্তি না করলে বেশি দিন আমরা টিকে থাকতে পারতুম না—আমাদের মনের অবস্থা মাসের পর মাস তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে ওঠে।

কাছারি-ঘরে আমার ডাক পড়ে। কমান্ডাঁ আমাকে একটা ছুটির ছাড়পত্র আর যাতাযাতের পাশ দেন—আর আমার যাত্রা যেন সুখের হয় এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাতায়াত তিনদিন, ছুটি চৌদ্দ

দিন, সবশুদ্ধ আমি সতেরো দিন ছুটি পেয়েছি। এ এমন কি বেশি হল, আমি বলি যাতায়াতের জন্যে পাঁচ দিনের ছুটি পেতে পারি না?

লেটিস্ক আমার ছাড়পত্রটা দেখিয়ে বলেন যে, শীঘ্রই আমাকে ফ্রন্টে ফিরে যেতে হবে না, আমার ছুটির পর মাঠের ধারে একটা তাঁবুতে আমাকে ট্রেনিং-এর কাজে যেতে হবে।

অপর সকলে আমাকে শুভেচ্ছা জানায়। কাট্ আমাকে উপদেশ দেয়, চেষ্টা করে সমর-বিভাগের বড়ো ছাউনিতে কোনো একটা কাজ যোগাড় করে নিতে। এবং বলে—"বুদ্ধিমান হও তো সেই কাজেই শেষ পর্যন্ত লেগে থেকো।"

আরও আটদিনের আগে আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না। কারণ দিনগুলো বেশ কাটছে, ঐ আটদিন এই জায়গায় আমাদের দলকে থাকতে হবে।

আমি ছ'সপ্তাহের মতো চলে যাব—সৌভাগ্য বটে, কিন্তু আমি ফিরে আসবার আগে কি ঘটে যাবে বলা যায় না। এই সব সঙ্গীদের সঙ্গে আবার কি আমার দেখা হবে? ভেস্ট্স তো ইতিমধ্যেই মারা গেছে, এবার কার পালা?

সরাব খেতে খেতে প্রত্যেকের মুখের দিকে আমি একে একে তাকাই। আলবের্ট আমার পাশে বসে চুপ করে ধোঁয়া ছাড়ে। আমরা বরাবর একসঙ্গে কাটিয়েছি। অপর দিকে বসে কাট্—তার কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে, গোদা গোদা হাত আর শান্ত স্বর। উঁচু দাঁত আর প্রাণখোলা হাসি নিয়ে ম্যুল্যের; পিটপিটে চোখে ইয়াডেন; লেএআর একগাল দাড়ি গজিয়ে যেন চল্লিশ বছরের বুড়ো বনে গেছে।

পরের দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমি রেল ইস্টিশানে গিয়ে পৌছই। আলবের্ট আর কাট্ আমার সঙ্গে আসে। সেখানে পৌছে শুনি, এখনও

গাড়ির দু'ঘণ্টা দেরি আছে। ওরা দুজনে কাজে চলে যায়, আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নি।

গাড়ির পর গাড়ি বদল করে, সরাইখানার পর সরাইখানায় খেয়ে, কত জায়গায় বিশ্রাম করতে করতে আমি চলতে থাকি।

অবশেষে প্রাকৃতিক দৃশ্য মলিন রহস্যময় পূর্বপরিচিত দৃশ্যে পরিণত হয়। পশ্চিমের জানালার ফাঁক দিয়ে গ্রাম, খোড়ো চালের শাদা রঙ-করা কাঠের ঘর, পড়ন্ত আলোয় ঝিনুকের মতো ঝকঝকে শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, গোলাবাড়ি, বুড়ো নেবু গাছ, সব হু হু করে বেরিয়ে যায়!

স্টেশনের নামগুলো চেনা চেনা ঠেকতে থাকে, আমার বুক দুরু দুরু করতে থাকে। রেলগাড়ি এগিয়েই চলে, এগিয়েই চলে। আমি জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি—এই সব নামগুলির মধ্যে আমার কৈশোরের জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল।

টানা মাঠ আর শস্যক্ষেত্র। মাঠ যেখানে আকাশের গায়ে মিশে গেছে সেখান দিয়ে ভেড়ার পাল গুটি গুটি চলেছে। রেল লাইনের একটা বেড়ার ধারে চাষারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, মেয়েরা হাত নাড়ছে, ছেলেরা ডাঙালের ওপর খেলা করছে—এ রাস্তাটা ঐ গ্রামের মধ্যে চলে গেছে—মসৃণ রাস্তা—এখানে কামানের গাড়ি চলে না!

সন্ধ্যা হয় হয়। রেলগাড়ি যদি ঘড় ঘড় শব্দ না করত আমি হয়তো ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতুম।

বহুদূরে আকাশের গায়ে নীল রঙের পর্বতশ্রেণী জেগে ওঠে। ডোলবেন-বের্গের উঁচু নিচু সীমারেখা দেখেই চেনা যায়। পাহাড়টা বনের পারে খাড়া হয়ে আছে। পাহাড়ের ওপারেই শহর।

একটা চৌমাথা। আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান

থেকে কোনোমতেই নড়তে পারিনে। অপর সকলে তাদের মোট-ঘাট নিযে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়। আমি ঐ পরিচিত যে রাস্তাটা পেরিয়ে এলুম বার বার ওর নাম বলতে থাকি—ব্রেমেরস্ট্রাসে—ব্রেমেরস্ট্রাসে—

নিচের রাস্তায় সাইকেল করে, লরিতে করে লোক যাচ্ছে; ছাই রঙের গলিটা, এ যেন আমাকে আমার মায়ের মতো আলিঙ্গন করে ধরে; তারপর রেলগাড়ি থামে। স্টেশনের গোলমাল কমে আসে। আমি আমার জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে রাইফেল হাতে করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়ি। প্লাটফর্মের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখি। যারা আসছে যাচ্ছে তাদের কাউকেই আমি চিনিনে।

স্টেশনের ধার দিয়ে ছোটো নদীটি পথ ঘেঁষে বেগে বয়ে চলেছে। ঐখানে লেবুগাছের সামনে চৌকি পাহারার চৌকো বুরুজ্‌টা খাড়া রয়েছে।

এখানে আমরা কতদিন বসেছি—মনে হয় সে যেন কতকাল আগেকার কথা। এই সাঁকোর উপর দিয়ে বাঁধের জলের কটু গন্ধের মধ্যে দিয়ে কতবার আমরা পারাপার করেছি; সাঁকো থেকে নদীর উপর ঝুঁকে পড়ে দেখেছি ব্রীজের খুঁটি থেকে জলজ সবুজ লতা পাতা আগাছা ঝুলে পড়েছে।

সাকোর উপর দিয়ে এ-পাশে ও-পাশে তাকাতে তাকাতে আমি চলতে থাকি। টোপায় শেওলায় ভরা নদীর জল। সরু গলি দিয়ে কুকুরগুলো মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলেছে। বোঝা কাঁধে করে যাদেরই বাড়ির সামনে দিয়ে আমি চলেছি, দরজায় দাঁড়িয়ে তারা অবাক হয়ে আমায় দেখছে।

ঐ সেই বরফওয়ালার দোকান, যেখানে আমরা প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি টানতে শিখেছিলুম। প্রত্যেকটি চেনা দোকান চোখে পড়ছে—ঐ ডাক্তারখানা, ঐ তামাকের দোকান! শেষে আমি একটা

পুরোনো আগড-আঁটা খয়েরি রঙের দরজার সামনে এসে দাঁড়াই—আমার হাত আর উঠতে চায় না। ধীরে ধীরে আমি দরজা খুলি, একটা আশ্চর্য রকমের সজীবতা আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলে—আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

আমার বুটের চাপনে সিঁড়ি মচমচ্ করতে থাকে। উপরে একটা দরজা খোলার শব্দ হয়—কে যেন সিঁড়ির রেলিং ঝুঁকে দেখছে! রান্নাঘরের দরজা খোলা—সেখান থেকে আলুর কেকের খোসবোতে সারা বাড়িটা ভর্তি হয়ে গেছে। ঝুঁকে পড়ে দেখছিল ও আমার দিদি। এক মুহূর্তের জন্যে আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নি। তারপর আমার টোপ খুলে নিয়ে উপর দিকে তাকাই। হ্যাঁ, আমার বড়ো বোনই বটে।

সে বলে—"পাউল! পাউল!"

আমি মাথা নিচু করি, সরু সিঁড়ির গায়ে আমার পিঠের বোঝা ধাক্কা খায়, রাইফেলটা ভয়ানক ভারি।

দিদি একটা দরজা খুলে চেঁচিয়ে ডাকে—"মা, মা, পাউল এসেছে!"

আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে যত জোরে পারি আমার লোহার টোপ আর রাইফেল মুঠিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এক ধাপও আমি উঠতে পারিনে, আমার চোখের সামনে থেকে সমস্ত সিঁড়িটা মিলিয়ে যায়, বন্দুকের কুঁদোয় ভর দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, একটা কথাও কইতে পারিনে। দিদির গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র আমি যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করি, কথা কইবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোনো শব্দ বার হয় না। আমি সিঁড়ির ধাপের উপর অসহায় ভাবে আকাট মেরে দাঁড়িয়ে থাকি। কাঁদব না মনে করি, তবু আমার দুই গাল বেয়ে চোখের জল গড়াতে থাকে।

দিদি ফিরে এসে বলে—"কি হয়েছে, ব্যাপার কি?"

তখন আমি নিজেকে সামলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে উঠতে থাকি। বন্দুকটা এক কোণে ঠেসিয়ে রেখে আমার তল্পিতল্পাগুলোকে নামিয়ে টোপটাকে তার উপর ফেলে গলা ছেড়ে বলে উঠি—"একটা রুমাল এনে দাও।"

আমার দিদি দেরাজ থেকে একটা ঝাড়ন বার করে দেয়, আমি মুখটা মুছে ফেলি।

এইবার মা'র গলা শুনতে পাই, শোবার ঘর থেকে আওয়াজ আসছে।

আমি দিদিকে জিগগেস করি—"মা কি শুয়ে আছেন?" সে বলে—"মা অসুখে ভুগছেন।"

আমি মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে খুব শান্ত স্বরে বলি—"আমি এসেছি, মা।"

অস্পষ্ট আলোর মধ্যে মা চুপ করে শুয়ে থাকেন। তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে জিগগেস করেন—"তোর কি চোট্ লেগেছে?" মনে হয় যেন তাঁর দৃষ্টি আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে।—"না মা, আমি ছুটি পেয়েছি।"

মা'র মুখ বড়ো শাদা হয়ে গেছে—আলো জ্বালতে আমার ভয় হয়।

মা বলেন—"তুই এলি, কোথায় হাসিখুশি করে বেড়াব—না আমি বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদছি।"

আমি বলি—"মা, অসুখ করেছে কি?"

মা বলেন—"আজ আমি একটু উঠব; আজ ভাবছিলুম টেঁপারির চাটনিটা খুলব। তোর খেতে খুব ভালো লাগে, না রে?"

—"হ্যাঁ মা, অনেকদিন ওটা খাওয়া হয়নি।"

দিদি হেসে বলে—"তুমি আসবে, আমরা বোধ হয় টের পেয়েছিলুম। ঠিক তুমি যা ভালোবাস, আজ আলুর কেক্ তৈরি হচ্ছে—তার উপর টেঁপারির চাটনিও হল।"

আমি বলি—"তার উপর আজ শনিবার।"

মা বলেন—"আমার পাশে এইখানে বোস।"

মা আমাব দিকে তাকান। আমার হাতের পাশে মায়ের হাত ভাবি শীর্ণ দুর্বল রক্তহীন মনে হয। আমরা বেশি বথা কই না, মা বেশি কিছু জিগগেস করেন না, এতে আমিও খুশি হই। বলবারই বা কি আছে? যা কিছু চাইতে পাবি সবই তো আমি পেযে গেছি। যুদ্ধের মধ্যে থেকে নিরাপদে ফিরে এসে মায়ের পাশে বসেছি, এর বেশি আর কি চাই? হেঁসেলে আমার দিদি দাঁড়িযে রাত্রের রুটি তৈরি করতে করতে গান গাইছে। আমি বেশ জানি যে টেঁপারির চাটনিটুকু অনেক দিন ধরে ওঁরা সংগ্রহ করে রেখেছেন—আমারই জন্যে।

আমি মা'র বিছানার পাশে বসে থাকি, জানালার ভিতর দিয়ে বাগানে বাদাম গাছগুলোয খযেরি আর সোনালি রঙ ঝক্‌ঝক্ করছে দেখা যায। আমি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের মনে মনে বলতে থাকি—"ঘরে এসেছি, ঘরে ফিরে এসেছি!" কিন্তু একটা অপরিচযের ভাব যেন কিছুতেই কাটতে চায না। এই তো আমার মা, এই আমার দিদি, ঐ সেই কাঁচের বাক্সে আমার সংগ্রহ-করা প্রজাপতি ক'টা, মেহেগেনি কাঠের পিয়ানো—কিন্তু আমি যেন সেখানে নেই! আমার আর এই সবের মাঝে যেন ব্যবধান রচনা হয়ে গেছে!

আমি আমার জিনিসপত্র খুলে কাটের দেওয়া একটা গোটা এডামার পনীর, দুটো ফৌজি রুটি, দেড় পোয়া মাখন, দু'টিন লিভার সসেজ, আধ সের চর্বি আর ছোটো এক পোঁটলা চাল বার করে বলি—"এগুলো কাজে আসবে তো?"

মা, দিদি ঘাড় নাড়েন।

আমি জিগগেস করি—"এখানে খাবার-দাবার পাওয়া বড়ো মুশকিল হয়েছে, না?"

"—হ্যাঁ, খাবারের বড়ো অভাব। তোমরা ওখানে বেশ খেতে পেতে তো?"

আমি হেসে আমার আনা জিনিসগুলো দেখিয়ে বলি—"সব সময় অবশ্য এত পেতুম না, তবে যা পেতুম তা মন্দ নয়।"

দিদি খাবার আনতে যায়। হঠাৎ মা আমার হাত ধরে জিগগেস করেন—"ওখানে বড়ো বিশ্রী, না রে পাউল?"

এর কি জবাব দেব মা? তুমি কখনোই বুঝতে পারবে না, তোমার বোঝা উচিতও নয়। তুমি মা জিগগেস করছ, বিশ্রী কি না? আমি ঘাড় নেড়ে বলি—"না মা, এমন কিছু খারাপ নয়। সেখানে আমরা অনেকে এক সঙ্গে থাকি—কাজেই একরকম মন্দ কাটে না।"

—"হ্যাঁ, কিন্তু সেদিন এখানে ব্রেডেমেয়ের এসেছিল, সে বললে বিষাক্ত গ্যাস, তারপর আরও কত কিছুর নাম করলে—বললে, ওখানকার অবস্থা অতি ভীষণ।"

মা'র ভয় কেবল আমারই জন্যে। আমি কি বলব? বলব কি যে একদিন দেখেছিলুম শত্রুদের তিন তিন খানা ট্রেঞ্চের যত রক্ষী সব বিষাক্ত গ্যাসে অসাড় হয়ে মুখ নীল করে মরে পড়ে রয়েছে?

আমি বলি—"না মা ও সব গল্প। ব্রেডেমেয়ের যা বলেছে বাড়িয়ে বলেছে। দেখ না এই তো আমাকে—আমি তো বেশ ভালো ফিট্‌ফাট্ রয়েছি।"

মা'র উদ্বেগের সামনে আমি বেশ স্থৈর্য রক্ষা করি।

আমি রান্নাঘরে দিদির কাছে গিয়ে বলি—"মায়ের কি অসুখ হয়েছে?"

সে ঘাড় নেড়ে বলে—"দু'মাস হল মা বিছানায় পড়েছেন। আমরা ইচ্ছে করে তোমাকে লিখিনি। অনেক ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। একজন বলেছেন, হয়তো আবার ক্যান্সার দেখা দিয়েছে।"

ডিস্ট্রিক্ট কম্যাণ্ডারের কাছে আমাকে হাজিরা দিতে যেতে হল। আস্তে আস্তে রাস্তা দিযে চলেছি। কচিৎ কেউ আমার সঙ্গে কথা কইছে। কথা কইবার আমার আদৌ ইচ্ছে নেই, তাই আমি যত তাড়াতাড়ি পারি সরে পড়ছি।

সেনাবারিক থেকে ফেরবার পথে কে উচ্চৈস্বরে আমায ডাকলে। আমি আনমনা ছিলুম, ফিরে তাকিয়ে দেখি আমাব সামনে একজন মেজর দাঁড়িয়ে। তিনি তর্জন করে ওঠেন—"সেলাম করতে পার না ?"

আমি থতমত খেযে বলি—"তার জন্যে দুঃখিত মেজর, আমি আপনাকে দেখতে পাইনি।"

তিনি গর্জে ওঠেন—"কেমন করে কথা কইতে হয় শেখনি নাকি ?"

আমার ইচ্ছা করল, মুখে এক-ঘা বসিযে দি ; কিন্তু নিজেকে সামলে নিলুম কারণ এর উপর আমার ছুটি নির্ভর করছে। আমি গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললুম—"আপনাকে আমি দেখতে পাইনি হের্ মেজর।"

তিনি বললেন—"এবার থেকে চোখ খুলে চলবে। তোমাব নাম কি ?"

নাম বললুম।

তাঁর থোঁতা মুখ লাল হয়ে উঠল—"কোন রেজিমেণ্ট ?" আমি সঠিক বিবরণ দিলুম। তবুও তিনি বুঝতে পারেন না, বলেন—"রেজিমেণ্ট এখন কোথায ?"

আমি বলি—"লাঙ্গেমার্ক আব বিক্সশুটের মধ্যে।"

তিনি অবাক হযে বলেন—"কোথায !"

আমি বুঝিযে বলি যে সবেমাত্র দু এক ঘণ্টা হল আমি ছুটিতে এসেছি। ভাবলুম এইবার হয়তো শুনে চলে যাবেন। কিন্তু মোটেই তা হল না! তিনি আবও রেগে উঠে বলেন—"ও, তোমরা বুঝি ভাব

তোমাদের, ফ্রন্ট-লাইনের চালচোল এখানেও চালাবে? এখানে ও সব চলবে না। ভগবানের দয়ায় আমাদের এখানে তবু আদব-কায়দা বলে একটা জিনিস আছে। যাও, কুড়ি পা পিছিয়ে গিয়ে ডবল মার্চ।"

আমি রাগে অন্ধ হয়ে যাই। কিন্তু আমি প্রতিবাদ করতে পারিনে। তিনি ইচ্ছে করলেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। কাজেই তাঁর আদেশ পালন করে আড়ষ্ট হয়ে সেলাম করে দাঁড়াই।

তিনি আমায় ডেকে বলেন যে তিনি আমায় শাস্তি না দিয়ে দয়া দেখাতে পেরে খুশি হয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতার ভাব দেখাই।

—"যাও ডিসমিস!"

আমি ঘুরে চলে যাই। এই ঘটনায় সারা সন্ধ্যাটাই মাটি হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার সৈন্যের পোশাক খুলে ফেলে দি; আগেই এটা আমার করা উচিত ছিল। তারপর আমার সাধারণ পোশাক বার করে তাই পরি।

পুরোনো পোশাকগুলো গায়ে যেন আঁট হয়, যুদ্ধে থাকতে থাকতে আমার শরীর ফুলে উঠেছে। কলার আর টাই কোনোমতেই গলায় হতে চায় না। শেষে দিদি এসে আমার গলায় ফিতে বেঁধে দেয়। কিন্তু সুটটা কি ভীষণ হাল্কা লাগছে, মনে হচ্ছে যেন একটা পাতলা কামিজ আর পাজামা পরে রয়েছি।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার চেহারা দেখি। ভারি অদ্ভুত লাগে। মা আমাকে ঘরোয়া পোশাক পরতে দেখে খুশি হন; এ পোশাকে আমাকে তাঁর কম অচেনা লাগে। কিন্তু আমার বাবা চান যে আমি আমার সেপাইএর উর্দি পরেই থাকি, যাতে তাঁর বন্ধুদের কাছে আমায় নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমি রাজী হইনে।

আমার ভারি ইচ্ছে করে চুপচাপ একা একা বসে থাকি। কিন্তু মেলা লোক মিলে তা হতে দেয় না। এক আমার মা-ই দেখি আমায় কোনো প্রশ্ন করেন না। কিন্তু বাবা এ রকম নন। তিনি আমাকে দিয়ে কেবলই ফ্রণ্টের গল্প বলাবার চেষ্টা করেন। লড়াইয়ের গল্প পেলে তিনি আর কিছুই চানন্না। কিছু কিছু মজার ঘটনা তাঁকে আমি বলি। কিন্তু তিনি জানতে চান আমি কখনও হাতাহাতি যুদ্ধ করেছি কিনা। আমি "না" বলে উঠে চলে যাই।

রাস্তায় ট্রাম গাড়ির শব্দে দু'বার আমি চমকে উঠি। হঠাৎ মনে হয়েছিল যেন গোলা ছুটে আসছে, তারই শব্দ। কে একজন আমার কাঁধে হাত দিয়ে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেললে—"এই যে, তারপর ওখানকার খবর কি? ভীষণ ব্যাপার চলেছে, না? তা হ্যাঁ যতই ভয়ানক হোক, যুদ্ধ আমাদের চালিয়েই যেতে হবে। যাই হোক, তোমরা ওখানে খাবারটা বেশ ভালোই খেতে পাও, আমরা তো তাই শুনি। তোমার চেহারা তো বেশ ভালোই ঠেকেছে পাউল। এখানকার অবস্থাই বরং খারাপ। দেশের ভালো বস্তু সব সৈন্যদের জন্যে, এ তো আমাদের দিতেই হবে কি না।"

তিনি আমায় টানতে টানতে একটা টেবিলে নিয়ে যান, সেখানে আরও অনেকে বসে ছিলেন। তাঁরা আমায় অভিনন্দন করেন। একজন হেডমাস্টার মশাই আমার করমর্দন করে বলেন—"তারপর, তুমি ফ্রণ্ট থেকে আসছ, না? ওখানকার ব্যাপার কি রকম? চমৎকার, না? ভারি চমৎকার, অ্যাঁ?"

তিনি হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন—"তা আমি বেশ জানি। আগে ব্যাং-খেকো ক'টাকে (ফরাসিদের) বেশ করে শিক্ষা দিয়ে দাও, তবে তো বুঝি! চুরুট খাও নাকি? এইটে খেয়ে দেখো।"

দুর্ভাগ্যবশত চুরুটটা গ্রহণ করাতে আমাকে আরও খানিকক্ষণ বসতে

হল। আর তাঁরা সবাই আমার জন্যে এত আগ্রহ দেখাতে লাগলেন যে আপত্তি জানানো অসম্ভব হল। যাই হোক আমি যত জোরে পারি' প্রাণপণে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলুম।

কোথাকার কতখানি জায়গা আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই নিয়ে তাঁরা তর্ক শুরু করলেন। হেডমাস্টারমশাই চান সারা বেলজিয়ামটা, ফ্রান্সের কয়লার খনিগুলো আর রাশিয়ার একটা চাক্‌লা। তিনি এই দখলের কারণ দেখাতে থাকেন, এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে স্বীকার করিয়ে তবে ছাড়েন। তারপর তিনি বোঝাতে থাকেন, ফ্রান্সের কোন জায়গা দিয়ে আমাদের ফৌজ ওদের ব্যূহ ভেদ করে বেরবে। তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন—"তোমাদের ঐ ট্রেঞ্চ যুদ্ধের প্রণালী ছেড়ে দাও, সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যুদ্ধ শান্তি হবে।"

আমি বলি—"আমার মনে হয় শত্রুশ্রেণী ভেদ করে ফেলা সম্ভব হবে না, কারণ হয়তো ওদের পিছনে অনেক বেশি রিজার্ভস্ থাকতে পারে। তা ছাড়া এখান থেকে যা মনে হয় তার সঙ্গে আসল যুদ্ধ জিনিসটার অনেক পার্থক্য আছে।"

তিনি বুক ফুলিয়ে বলেন—"ও সব বাজে। তুমি কিছু জানো না। খুঁটি-নাটি বিষয়ে তোমরা হয়তো ভালো জানতে পার কিন্তু যুদ্ধটার সমগ্র ছবি তোমাদের চোখে নেই। তোমরা শুধু তোমাদের নিজেদের ছোট্ট দলটিকে দেখতে পাও, কাজেই সমস্তটা নিয়ে তোমরা বিচার করতে পার না। তোমরা তোমাদের কর্তব্য করছ, তোমাদের প্রাণ বিপন্ন করছ, এ খুব উচ্চ সম্মানের কথা—তোমাদের প্রত্যেকেরই 'আয়রন্ ক্রস্' পাওয়া উচিত, কিন্তু গোড়ায় ফ্লাণ্ডার্সে তোমাদের শত্রুদের লাইনকে ভেঙে দিতেই হবে, তারপর করতে হবে ছত্রভঙ্গ, তারপর সোজা প্যারিসে ঢুকে পড়বে।"

আমি উঠে পড়ি। তিনি আরও কয়েকটা চুরুট আমার পকেটে ভরে দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বিদায় দেন।

ছুটিটা যে এ রকম ভাবে কাটাতে হবে তা আমি ভাবিনি। আমি একলা থাকতে চাই, যাতে কেউ না এসে আমায় বিরক্ত করে। সবাই সেই একই কথা জানতে চায়, 'যুদ্ধটা চমৎকার চলছে, না যুদ্ধটা বড়ো বিশ্রী চলছে।'

ওরা আমার সঙ্গে বড়ো বেশি কথা কয়। ওদের উৎকণ্ঠা, ওদের বাসনা, ওদের লক্ষ্য আমি উপলব্ধি করতে পারি না। যখন আমি ওদের ঘরে ওদের আপিসে, ওদের কর্মের মধ্যে ওদের নিযত দেখতে পাই, ওদের জীবনের প্রতি আমার ভারি একটা আকর্ষণ হয়, মনে হয় আমিও এইখানে লড়াই ভুলে বসে থাকি। কিন্তু একটা বিতৃষ্ণাও জাগে, মনে হয় এত সঙ্কীর্ণতা এত ক্ষুদ্রতা কি করে মানুষের জীবনকে পূর্ণ করতে পারে! ফ্রণ্টে যখন গোলার টুকরো শন্ শন্ করে ছুটছে, আকাশে তারাবাজি ফুটছে, বর্ষাতির চাদরে ঝুলিযে আহতদের নিযে আসা হচ্ছে, কমরেডরা ট্রেঞ্চের মধ্যে গুড়ি মেরে বসে আছে, ওরা কেমন করে এখানে বসে বসে এ রকম ভাবে দিন কাটায়।

আমার ঘরে আমার টেবিলের পিছনে একটি খয়েরি চামড়া মোড়া কেদারার ওপর আমি বসে আছি। দেযালের গায়ে অসংখ্য ছবি যেগুলো আমি একসময় নানা খবরের কাগজ থেকে কেটে বার করতুম, তাদের মাঝে মাঝে—যখন যা-কিছু ছবি-আঁকা পোস্টকার্ড পেযেছি তাও রযেছে। ঘরের কোণে একখানা ছোট্ট স্টোভ। দেওযালের গায়ে আমার বই রাখার তাক।

যুদ্ধে যাবার আগে এই ঘরে আমি থাকতুম। ছেলে পড়িয়ে আমি যে

টাকা পেতুম তাই দিয়ে অল্পে অল্পে এই বইগুলো আমি কিনেছি। তার মধ্যে অনেক সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইও কিনেছিলুম। কতকগুলো বই অবশ্য আমার অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে। কারও কাছ থেকে ধার করে পড়তে এনে আমার সেগুলো এত ভালো লেগে গেছে যে আর ফিরিয়ে দিইনি।

একটা তাকে স্কুলের পড়ার বইগুলো ঠাসা। এগুলো অযত্নে রয়েছে। অনেক ঘাঁটা-ঘোঁটা হয়েছে, মাঝে মাঝে পাতাও ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। এই তাকের তলাটা পত্রিকায়, খবরের কাগজে, চিঠিপত্রে, আর হিজিবিজি ড্রয়িং স্কেচ ইত্যাদিতে ভর্তি।

আমি ভাবি যে পুরানো দিনের মধ্যে ফিরে যাই আর একবার। সেই আগেকার দিনগুলো—অতীত কালটা এখনও যেন এই ঘরের দেয়াল-গুলোর মধ্যে আটকা পড়ে রয়েছে মনে হয়। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ আরাম করে আমি কেদারাটায় বসলুম। জানালাটা খোলা রয়েছে—তার মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমার সেই চিরদিনের চেনা রাস্তাটি যেটা চূড়ো-ওয়ালা গির্জার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। টেবিলের উপর আমার কলম, বড়ো একটা কড়ির কাগজ-চাপা, কালির দোয়াত, সমস্তই আগেকার মতো রয়েছে—কিছুই বদলায়নি!

বেঁচে থাকি তো যুদ্ধের পরে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসে ঠিক আজ যেমন দেখছি, এমনিই সেদিনও দেখব। দেখব ঠিক এমনি ভাবেই এই ঘরে বসে আছি।

মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু এরকমটা হওয়া আমার পক্ষে ঠিক নয়— আমি উত্তেজনা চাইনে, আমি চাই আবার সেই সুগভীর শান্তি— বইয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাই।

আমার মনে পড়ল, একবার কেমেরিখের মায়ের সঙ্গে দেখা করা উচিত। মিটেলস্টাডের সঙ্গেও এখানকার সেনাবারিকে একবার দেখা

করা যেতে পারে। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি রাস্তা ছাড়িয়ে পিছনে দূরে পাহাড়ের শ্রেণী ঝাপসা হয়ে এসেছে। তারপর সে দৃশ্য মুছে গিয়ে যেন দেখতে থাকি এক পরিষ্কার শরতের দিনে কার্ট্, আলবের্টের সঙ্গে বসে খোসাশুদ্ধ আলু পুড়িয়ে খাচ্ছি।

কিন্তু এ চিন্তাতেও আমার দরকার নেই। আমি চাই এই ঘর যেন কথা কয়ে ওঠে, এই ঘর যেন আমাকে অধিকার করে নেয়।

বইগুলো সারি সারি সাজানো আছে—যেমন গুছিয়ে রেখেছিলুম সেই ভাবেই! আমি তাদের মিনতি করে বলতে থাকি—আমাকে আবার তোমরা গ্রহণ করো, আমার সঙ্গে কথা কও! তোমরা আমার বাল্যের জীবন, তোমাদের কোনো বালাই নেই—তোমরা সুন্দর—আমাকে আবার তোমাদের মধ্যে ডেকে নাও—

আমি বসে থাকি—

আমার মনের মধ্যে আগেকার নানা কথা ছায়ার মতো ভেসে বেড়াতে থাকে। আমার অস্থিরতা বেড়ে ওঠে। হঠাৎ একটা বিষম অপরিচয়ের ভাব মনে জাগে!

একটা বই তুলে নিয়ে পড়বার জন্যে তার পাতা উল্টোতে থাকি। সেটাকে রেখে দিয়ে আর একটা নিই। এটার মধ্যে এ-পাতে ও-পাতে আমার হাতের পেন্সিলের দাগ দেওয়া রয়েছে। সেইগুলোকে দেখি আর পাতা ওল্টাই, তারপর নতুন বই নিই। দেখতে দেখতে আমার পাশে একরাশ বই জমা হয়ে যায়। আরও বইয়ের পর বই, পত্রিকার পর পত্রিকা, কাগজ চিঠিপত্র তারই উপর রাশীকৃত হয়ে ওঠে।

আমি নির্বাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি—যেন বিচারকের সামনে দাঁড়িয়েছি!

সমস্ত উদ্যম চলে গেছে!

অক্ষরের পর অক্ষর, বাক্যের পর বাক্য—আমি তাদের মর্ম গ্রহণ করতে পারিনে!

আস্তে আস্তে আমি বইগুলোকে তাকে নিজের জায়গায় তুলে রাখি। আর নয়!

তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই।

আমার বন্ধু মিট্রেলস্টাড শুনেছিলুম এখানকার সেনাবারিকে আছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

মিট্রেলস্টাড আমায় এমন একটা খবর দিলে যে সেই মুহূর্তে আমি চমকে উঠি! সে বলে যে আমাদের কান্টোরেক মাস্টারমশাইকে দেশরক্ষী ফৌজের দলে ভর্তি করে নিয়েছে।

সে দুটো ভালো চুরুট বার করে বলে—"ভেবে দেখ, হাসপাতাল থেকে এখানে এসেই প্রথম দেখা তার সঙ্গে! সে আমার দিকে তার থাবা বাড়িয়ে বললে—কি মিট্রেলস্টাড কেমন আছ? আমি তার দিকে তাকিয়ে বললুম—টেরিটোরিয়াল কান্টোরেক, কাজের সময় কাজ ফূর্তির সময় ফূর্তি, এটা তোমার ভালো করেই জানা উচিত। তোমার উপর-ওয়ালার সঙ্গে যখন কথা কইবে, কায়দাদোরস্ত ভাবে দাঁড়াবে। আঃ তখন যদি তার মুখটা দেখতে! সে আর একবার ভাব করবার চেষ্টা করলে। আমি আর এক দাবড়ি দিলুম। তখন সে তার প্রধান অস্ত্র বার করলে; আমায় খুব গোপনে জিগগেস করলে—তোমার জন্যে যাতে একটা বিশেষ পরীক্ষা বসানো যেতে পারে তার জন্যে আমাকে দিয়ে তুমি চেষ্টা করাতে চাও কি? আমি শুনে ভীষণ চটে গেলুম, গিয়ে তাকে আর একটা কথা মনে করিয়ে দিলুম, বললুম—টেরিটোরিয়াল কান্টোরেক, দু'বছর আগে তুমি আমাদের যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাবার

জন্তে উপদেশ দিয়েছিলে। আমাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ইওসেফ বেএম্, সে নাম লেখাতে চায়নি। তুমি যদি তাকে খুঁচিয়ে না পাঠাতে সে তিন মাস বেশি বাঁচতে পারত। কারণ, তুমি বক্তৃতা দেবার তিন মাস পরে তবে জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধে যাওয়ার নিয়ম সরকার থেকে অবশ্য-কর্তব্য করা হয়েছিল। তুমি না খোঁচালে তিনমাস সে বেশি বাঁচতে পারত। এখন যাও ডিস্‌মিস্, পরে তোমায় আরও কিছু বলব।"

আমাদের হাওয়াদের ময়দানে যাই। কোম্পানির সকলে জড়ো হয়েছে। মিট্রেলস্টাড তাদের সহজভাবে দাঁড়াতে বলে পর্যবেক্ষণ করে!

কাণ্টোরেককে দেখে আমার হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। তার গায়ে একটা ফিকে নীল খাটো কোর্তা—তার হাতায় পিঠে বড়ো বড়ো ছুটো তালি। ওভারকোটটা একটা দৈত্যের গায়ের মাপের। কালো রঙের ক্ষয়ে-যাওয়া পাজামা অত্যন্ত খাটো। বুটজোড়া পুরোনো, অত্যন্ত কড়া, তার উপর পায়ে বেজায় ঢিলে হয়েছে। এরই অনুপাতে টুপিটা খুব ছোটো। সমস্ত দেখলে সত্যি দয়া হয়!

মিট্রেলস্টাড তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—"টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক তোমার ঐ বোতামগুলোকে কি তুমি বলতে চাও চকচকে? তুমি দেখছি কোনোদিন কিছু শিখবে না। একেবারে অনুপযুক্ত কাণ্টোরেক, একেবারে অনুপযুক্ত!"

আমি আহ্লাদে একেবারে ফেটে পড়লুম। কাণ্টোরেক ইস্কুলে মিট্রেল-স্টাডকে ঠিক ঐ রকম করে শাসন করত—"একেবারে অনুপযুক্ত মিট্রেল-স্টাড, একেবারে অনুপযুক্ত!"

মিট্রেলস্টাড তাকে তিরস্কার করে চলল—"বোওট্‌শেরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি—ওর কাছে শেখো।"

নিজের চোখকে বিশ্বাস করা আমার অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের

ইস্কুলের হরকরা বোওট্শেরও সেখানে রয়েছে। সেই বোওট্শের হল আদর্শ! কাণ্টোরেক আমার দিকে তাকিয়ে দেখে—যেন আমায় পেলে গিলে খায়! কিন্তু আমি যেন তাকে চিনতেই পারছিনে এমনই ভালো মানুষটির মতো তার দিকে চেয়ে থাকি।

এই মাস্টারটি যখন তাঁর ডেস্কের পিছনে বসে পেন্সিল উঁচিয়ে কেবল আমাদের ভুল আবিষ্কার করতেন, তখন কি ভয়ে ভয়ে তাঁর সামনে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হত! সে তো মাত্র দু' বছর আগের কথা—এখন তিনি টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক, তাঁর বক্তৃতা থেমে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, আঁকশির মতো বাহু, ময়লা বোতাম, হাস্যকর পোশাক, একেবারে তালপাতার সেপাই বনে গেছেন!

মিট্রেলস্টাডের কাছে কাণ্টোরেক এর চেয়ে ভালো ব্যবহার কখনোই আশা করতে পারে না, কারণ সে মিট্রেলস্টাডের প্রোমোশান একবার বন্ধ করেছিল, আর ফ্রণ্টে ফিরে যাবার আগে মিট্রেস্টাডের পক্ষে এমন সোনার সুযোগ ছেড়ে দেওয়া মস্ত বোকামি হবে। এমন সৌভাগ্য যদি হাতে পাওয়া যায় তো এর পরে মরেও সুখ আছে।

মিট্রেলস্টাড তাদের হামাগুড়ি দেওয়ার ব্যায়াম শুরু করালো। কনুই আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বন্দুক ঘাড়ে কাণ্টোরেক তার হাস্যকর ভঙ্গী নিয়ে আমাদের সামনে বালির উপর হামাগুড়ি দিতে থাকে। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপিয়ে উঠছে।

মিট্রেলস্টাড ইস্কুল-মাস্টার কাণ্টোরেকেরই মুখের কথা দিয়ে কাণ্টোরেককে উৎসাহিত করতে লাগল—"টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক, অনেক পুণ্যে আমরা এই মহান যুগে জন্মেছি, আমাদের উচিত অন্তত একবারের জন্যেও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে নম্র হতে শেখা।"

কাণ্টোরেক ঘেমে উঠে তার দাঁতে-বেঁধা একটা কুটো থু করে ফেলে দেয়।

মিট্রেলস্টাড ভৎসনার সুরে বললে—"আর এই ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে আমাদের মহান কর্মক্ষেত্রের কথা যেন কোনোদিনই ভুলে না যাই টেরিটোরিয়াল কাণ্টোরেক!"

ছুটিটা আর কিছু নয়, একটুখানি অবকাশ, যেটা ফুরিয়ে গেলে পর সব কিছু আরও খারাপ লাগে। এখন থেকেই ছাড়াছাড়ির ভাবনা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মা নীরবে আমাকে লক্ষ্য করছেন—আমি জানি তিনি দিন গুণছেন! প্রতিদিনই সকালে তাঁকে ম্রিয়মান দেখি, তিনি রোজই গোণেন, একটা দিন চলে গেল! তিনি আমার তল্পি-তল্পা সরিয়ে রেখে দিয়েছেন, যাতে সেগুলো চোখে পড়ে বিদায়-দিনের কথা মনে না আসে!

ছুটি ফুরোবার চার দিন মাত্র বাকি আছে, এইবার কেমেরিখের মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত।

সে আমি লিখে জানাতে পারব না। কাঁদতে কাঁদতে তিনি আমায় কেবল ঝাঁকুনি দেন আর বলতে থাকেন—"সে যদি মরে গেছে, তবে তুমি কেন বেঁচে আছ?" আমাকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলেন—"তুমি তবে সেখানে কি করতে ছিলে, বাছা?" তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলেন—"তুমি তাকে দেখেছিলে? সেই সময় তাকে দেখেছিলে? কেমন করে সে মারা গেল?"

আমি তাঁকে বললুম যে তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে গুলি চলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সে মারা পড়ে। তিনি আমার দিকে তাকান, আমার উপর সন্দেহ হয়, বলেন—"মিছে কথা বলছ। আমি জানি—আমি মনে মনে অনুভব করেছি কি ভীষণ কষ্ট পেয়ে সে মারা গেছে! আমি রাত্রে তার গলা শুনেছি; তার যন্ত্রণা আমার প্রাণে এসে

লেগেছে। সত্যি কথা বল—আমি জানতে চাই, আমি সত্যি কথা জানতে চাই।"

আমি বলি—"না, আমি তার পাশেই ছিলুম। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।"

তিনি মিনতি করতে থাকেন—"বল আমায়; আমাকে বলতেই হবে। আমি জানি তুমি আমায সান্ত্বনা দিতে চাও, কিন্তু দেখছ না, তুমি সত্যি কথা চেপে রেখে আমায কষ্ট দিচ্ছ বেশি? অনিশ্চয়তা আমি সইতে পারছিনে। বলো ঠিক কেমন ধারা হয়েছিল, যদি তা অতি ভযঙ্করও হয সেও ভালো। তুমি না বললে আমার আরও বীভৎস মনে হবে।"

আমি কোনোমতেই তাঁকে বলব না, আমায পিষে ফেললেও নয়। আমি তাঁকে যত প্রবোধ দিই, তিনি অবুঝের মতো কেবলই আমায বিরক্ত করেন। কেন যে তিনি শান্ত হন না বুঝতে পারিনে। যেমন করে কেমেরিখ মারা গেছে তা তিনি জানুন আর নাই জানুন, কেমেরিখ্ সে তো আর বাঁচবে না। আমরা যারা হাজার হাজার লোককে মরতে দেখেছি তাদের পক্ষে একজন মানুষের জন্তে এতখানি শোকেব কি অর্থ তা বোঝা মুশকিল। কাজেই আমি অধীর হয়ে বলি—"সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। কোনো কষ্টই পায়নি, তার মুখ বেশ শান্ত ছিল।"

তিনি চুপ করে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন—"তুমি শপথ করবে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তোমার কাছে সকলের চেয়ে যা পবিত্র তার নামে?"

হায় রে, আমার এমন কি আছে যা আমার কাছে পবিত্র? আমি বলি—"হ্যাঁ, সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।"

—"যদি একথা সত্যি না হয়, তাহলে যুদ্ধ থেকে তুমি কোনোদিনও আর ফিরবে না এই কথা বল।"

—"যদি সে মুহূর্তের মধ্যে মারা না গিয়ে থাকে, আমি যেন কথনও না ফিরি।"

সব কিছুই আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারতুম, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কেমেরিখের মা দেখলুম বিশ্বাস করেছেন।

ছুটির শেষ সন্ধ্যা, কাল বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। সকলেই নীরব। আমি সকাল সকাল বিছানায় শুয়ে পড়ি। বালিশটা আঁকড়ে ধরে তার মধ্যে মুখ লুকোই। কে জানে, আর কোনোদিন এমনি করে পালকের বিছানায় শুতে পাবো কি না!

গভীর রাত্রে মা আমার ঘরে আসেন। তিনি ভাবেন আমি ঘুমুচ্ছি, আমিও মট্‌কা মেরে পড়ে থাকি। এখন জেগে বসে দুজনে কথা কওয়া বড়ো কষ্টকর হবে।

যদিও তাঁর কষ্ট হয় তবু তিনি অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকেন। শেষে আমি আর চুপ করে পড়ে থাকতে পারি না, ভান করি, এইমাত্র যেন উঠলুম। বললুম—"যাও মা, ঘুমতে যাও, এখানে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।"

মা বললেন—"পরে আমি খুব ঘুমব।"

আমি উঠে বসে বলি—"আমি এখান থেকে সোজাসুজি ফ্রণ্টে যাব না মা। চার সপ্তাহ আমায় ট্রেনিং ক্যাম্পে কাজ করতে হবে। সেখান থেকে এক রবিবার আমি হয়তো এখানে আসতে পারি।"

মা চুপ করে থাকেন; তারপর জিগগেস করেন—"তুই কি বড়ো ভয় পেয়েছিস?"

—"কিছু না।"

—"আমি বলছিলুম ফ্রান্সে যখন যাবি সেখানে বেশি এদিক ওদিক করিসনে। ফরাসী মেয়েগুলোর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করিসনে—তারা মানুষ ভালো নয।"

ও গো মা আমার! তুমি কি এখনও ভাব আমি সেই কচিটি আছি? তোমার কোলে মাথা রেখে এখনও কি কাঁদতে পারি? বড়ো সাধ যায় অমনি করে কেঁদে প্রাণ জুড়োতে—কতই বা আমার বয়স বেড়েছে? ওই তো সেদিনও আমি বালক ছিলুম। ঐ তো আলনার গায়ে এখনও আমার ছেলে বয়সের ছোটো ছোটো পাজামা ঝুলছে—এ তো সেদিনের কথা—এরই মধ্যে কি সব ফুরিয়ে গেল?

আমি ধীর ভাবে জবাব দি—"আমরা যেখানে থাকি সেখানে মেয়েছেলে ঢোকবার হুকুম নেই।"

—"আর ফ্রণ্টে খুব সাবধানে থাকিস।"

মা গো মা! তোমাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে দুজনে এক সঙ্গে মরি না কেন? কি হতভাগা আমরা!

—হ্যাঁ মা, থাকব বৈ কি!"

—"আমি তোর জন্যে রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব পাউল।"

মা গো আমাব! চলো আমরা দুটিতে মিলে সেই দেশে চলে যাই যেখানে দুঃখকষ্টের বালাই নেই। দুটিতে আমরা একলা!

—"বিপজ্জনক কাজ ছাড়াও তো যুদ্ধে অন্য কাজ আছে, তারই কোনো কাজ নে না পাউল।"

"হ্যাঁ মা, হয়তো আমি রাঁধুনির কাজে ঢুকতে পারব। সে ব্যবস্থা করে নেওয়া শক্ত হবে না।"

—"তবে তাই কর্—আর যদি কেউ তোকে নিন্দে করে তো—"

—"তোমার কোনো ভাবনা নেই মা, সে নিন্দে আমার গায়ে লাগবে না।"

মা একটা নিশ্বাস ফেলেন।

—"এইবার শুতে যাও মা।"

মা উত্তর দেন না। আমি উঠে আমার কম্বলখানা মা'র গায়ে জড়িয়ে দি। মা আমার হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান, দাঁড়াতে কষ্ট হয়। আমি তাঁকে ঘরে নিয়ে যাই। কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসে থাকি।

—"আমি ফিরে আসবার আগে তোমার কিন্তু সেরে উঠতে হবে মা।"

—"হ্যাঁ বাছা।"

—"তুমি আমায় খাবার জিনিস পাঠাও কেন বলো তো মা? কিছু দরকার নেই, সেখানে আমরা যথেষ্ট খেতে পাই। এখানে রেখে দিলে বরং তোমাদের পেট ভরবে।"

বিছানার উপর অসহায় ভাবে মা আমার শুয়ে আছেন। যখন আমি চলে যাচ্ছি, মা তাড়াতাড়ি ডেকে বলেন—"তোর জন্যে দু'জোড়া ছোটো পাজামা আমি তৈরি করে রেখেছি, আসল পশমের তৈরি। সেগুলো তোর জিনিসের সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলিস্‌নে।"

হায় মা! আমি কি আর জানিনে এই পাজামাগুলি তৈরি করতে তোমায় কত হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে, কত ভিক্ষে করতে হয়েছে, কত অপেক্ষা করতে হয়েছে! মা ওগো! কেমন করে তোমায় ছেড়ে যাব? তোমার ছাড়া আর কারই বা দাবি আছে আমার উপর। এইখানে আমি বসে আছি, তুমি রয়েছ ওখানে শুয়ে—কত কথাই আমাদের বলবার আছে, কখনোই তা বলতে পারবো না।

—"আসি মা।"

—"এসো বাছা।"

অন্ধকার ঘর। মা'র নিঃশ্বাসের শব্দ আর ঘড়ির টিকটিক শুনতে পাচ্ছি। জানালার বাইরে বাতাস বইছে আর বাদাম গাছের মর্মর শব্দ!

আমি ঘরে ফিরে এসে বালিশটা কামড়ে পড়ে থাকি। খাটের লোহার

ডাণ্ডাগুলোকে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরি। ঘরে ফিরে আসা আমার কোনো মতেই উচিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলুম বেপরোয়া—প্রায় সব কিছুরই আশা ছেড়ে দিয়ে থাকতুম—তেমনটি আর কখনোই আমি হতে পারব না। আমি ছিলুম সৈনিক—এখন নিজের কাছে, মা'র কাছে সব কিছুর কাছে একটা অনন্ত যন্ত্রণার পাত্র হয়েছি।

ছুটি নিয়ে আসা আমার কখনোই উচিত হয়নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তেপান্তরের মাঠে ক্যাম্প—জায়গাটা আমার আগে থেকেই জানা ছিল। এইখানে হিমেলস্টোশের কাছে ইয়াডেন তরিবৎ শিক্ষা পেয়েছিল। এখন সেখানে কাউকে আমি জানি না—সব অদল বদল হয়ে গেছে। প্রতিদিন বাঁধা দস্তুরে কাজ বাজিয়ে চলি। সন্ধ্যাবেলা সাধারণত আমি সৈনিকদের আড্ডাঘরে হাজির হই। সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ পড়ে থাকে—আমি কিন্তু সেগুলো পড়ি না ; একটা পিয়ানো আছে সেটা বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে। সেনাবারিকের ঠিক পাশেই ধরা-পড়া রাশিয়ান সৈনিকদের গারদখানা। আমাদের আর তাদের মাঝখানে কেবল একটা কাঁটাতারের বেড়া। বন্দীরা প্রায়ই বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের কাছে চলে আসে। তাদের দাড়ি গোঁফওয়ালা জোয়ান গোছের চেহারা, মুখে একমুখ দাড়ি, তবু তাদের দেখে মনে হয় যেন ভারি ভীরু! তারা আমাদের ক্যাম্পের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আঁস্তাকুড়ের টিনের গামলাগুলো খুঁটে বেড়ায়। কি যে তারা সেখানে পায় তা সবারই জানা। আমরা খেতে পাই খুবই কম—শালগমের এক আধ টুকরো, আধোয়া মুলোর ডাঁটি, বাসি আলু,

আর যখন পাতলা জলের মতো ভাতের সুরুয়ার মধ্যে কয়েক কুচি গোরুর মাংসের আঁশ ভাসতে থাকে, আমরা মনে করি কি রাজভোগই পেলুম। কিছুই পড়ে থাকে না! যদি কেউ কোনো কারণে নিজের ভাগ না খায়, তার অংশ নেবার জন্যে গণ্ডা গণ্ডা লোক সদাসর্বদাই মজুত থাকে। হাতায় করে হাঁড়ির মধ্যে থেকে যে জিনিসগুলো কোনোমতেই ওঠে না, সেইগুলোই এঁটোর গামলায় ফেলে দেওয়া হয়, তার সঙ্গে হয়তো কখনো আর সব জঞ্জালের সঙ্গে দু এক কুঁচো শালগম, একটু বাসি রুটির টুকরো উঠে আসে।

এই এঁটো-ফেলা গামলার চারিদিকে বন্দীরা ঝুঁকে থাকে। যা পায় তাই তারা খুঁটে নেয়।

আমাদের এই শত্রুদের যে এমন ভাবে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এটা দেখতে কেমন আশ্চর্য লাগে। এদের চাষীদের মতো শাদাসিধে চেহারা, চওড়া কপাল, মোটা নাক, চাকাপানা মুখ, চ্যাটালো হাত আর ঘন চুল। এদের শস্য মাড়ানো, শস্য কাটানো, আপেল কুড়োনোর কাজে দেওয়া উচিত। এদের দেখে মনে হয় আমাদের দেশের চাষীর মতো এরাও ভালোমানুষ।

এরা যখন খাবার জন্যে ভিক্ষে করে বেড়ায়, দেখে ভারি প্রাণে লাগে। সকলেই কাহিল হয়ে পড়েছে, কেবল প্রাণরক্ষা করবার মতো খাবার তাদের দেওয়া হয়। ওদের শিরদাঁড়া, ঘাড় কুঁজো হয়ে পড়েছে, হাঁটুগুলো মচকে গেছে, যতটুকু জানে, আধ-ভাঙা দু'একটা জার্মান কথা বলে আমাদের কাছে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চায়।

কেউ কেউ তাদের পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। তবে বেশির ভাগ লোকই তাদের দিকে নজরই দেয় না।

তারা বিকেলবেলা আমাদের বারিকে বেসাত করতে আসে। একটু রুটির জন্যে তাদের যা-কিছু আছে তাই তারা বদল করে। তাদের

বুট-জুতোগুলো আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। আমাদের সৈনিকদের মধ্যে যাদের কাছে বাড়ি থেকে কিছু খাবারদাবার আসে তারাই বন্দীদের সঙ্গে বেচা-কেনা করতে থাকে। একজোড়া বুটের দাম দু'খানা কি তিন খানা ফৌজি রুটি; অথবা একখানা ফৌজি রুটি এবং এক টুকরো চিমড়ে শূয়োরের মাংস।
কিন্তু অধিকাংশ রাশিয়ান বহুদিনই যথাসবস্ব এইভাবে খুইয়ে বসে আছে। এখন তাদের গায়ে নিতান্ত ছেঁড়াখোড়া কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের চাষাগুলো দরদস্তুরে ওস্তাদ—তারা একজন রাশিয়ানের একেবারে নাকের সামনে একটা রুটি কি সসেজ নিয়ে গিয়ে ধরে বসে থাকে যতক্ষণ না খাবার জিনিসটার লোভে সে বুদ্ধি-শুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তখন ঐ খাবারটুকুর জন্যে সে যা-চাও তাই দিতে প্রস্তুত হয়।

পূর্বে অনেক দিন ছুটি ভোগ করেছি বলে রবিবার দিন আর আমি ছুটি পাই না। ফ্রন্টে যাবার আগের রবিবার আমার বাবা আর দিদি আমার সঙ্গে দেখা করে যান। সারাদিন আমরা সৈনিকদের আড্ডা ঘরে বসে কাটাই তারপর তাঁদের সঙ্গে আমি রেল স্টেশন পর্যন্ত যাই। তাঁরা আমাকে একবাটি জ্যাম্ আর এক থলে আলুর কেক্ দিয়ে বলেন যে মা আমার জন্যে তৈরি করে দিয়েছেন।
তাঁরা চলে গেলে আমি ক্যাম্পে ফিরে আসি। সন্ধ্যাবেলা কেকের উপর জ্যাম মাখিয়ে কয়েকটা আমি খাই। কিন্তু মুখে রোচে না। সেগুলো রাশিয়ানদের দিয়ে দেব বলে উঠে পড়ি। তারপর মনে হয়, উনুনের আঁচে তেতে-পুড়ে মা আমার জন্যে এগুলি করেছেন। আমি সেগুলিকে ব্যাগে ভরে কেবল দু'খানা কেক রাশিয়ানদের কাছে নিয়ে যাই।

নবম পরিচ্ছেদ

আমি শুনলুম আমাদের রেজিমেণ্টকে একটা জরুরি পাইক দলের সামিল করে নেওয়া হয়েছে—যেখানে যুদ্ধ প্রবলতম হয়ে উঠেছে, সেইখানে আমাদের পাঠানো হচ্ছে। শুনে মোটেই আনন্দ হয় না। আমাদের দলকে আমি এখানে-ওখানে খুঁজে ফিরি। শেষে একটা নির্দিষ্ট খবর পেয়ে আমাদের কাছারি-ঘরে গিয়ে আমার আগমন সংবাদ জানাতে পারি। সার্জেণ্ট মেজর আমাকে আটকে রেখে দেন। আর দু'দিনের মধ্যেই আমাদের কোম্পানী সেখানে এসে পৌঁছবে, সুতরাং আমার আর যাবার দরকার নেই। তিনি শুধোন—"ছুটিটা লাগল কেমন? এক রকম ভালোই কি বল?" আমি বলি—"কতকটা!" তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন—"হ্যাঁ, যদি আবার ফিরে আসতে না হত তা হলেই পুরোপুরি ভালো হত। শেষের দিকটাই তো প্রথম দিকটাকে মাটি করে দেয়।" নোংরা, বিষণ্ণ, ধূসর, খপিস মূর্তিতে আমাদের কোম্পানি এসে পৌঁছয়। আমি লাফিয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে চারিদিকে খুঁজতে থাকি। ঐ যে ইয়াডেন, ঐ যে মূল্যের নাক ঝাড়ছে, ঐ যে কাট্ আর ক্রোপ্। আমরা আমাদের বিচালির আঁটিগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে

নি। শোবার আগে আমি আমার আলুর কেক আর জ্যাম্ বার করে তাদের খেতে বলি। উপরের কেক দুটো একটু মিইয়ে গেছে—তবু খাওয়া চলবে।

কাট্ খেতে খেতে বলে—"এগুলো তোমার মা'র কাছ থেকে এসেছে বুঝি ?"

আমি ঘাড় নাড়ি।

সে বলে—"চমৎকার ! চেখেই ঠিক বুঝতে পেরেছি।"

আমার যেন কান্না আসে। নিজেকে যেন আর সামলে রাখতে পারিনে। এটা অনভ্যাসের ফল। কাট্, আলবের্ট এদের মধ্যে থাকলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্রোপ্ ফিস্ ফিস্ করে বলে—"তোমাদের ভাগ্য ভালো, শুনতে পাচ্ছি আমরা রাশিয়ায় যাব।"

রাশিয়া ? সেখানে তো খুব বেশি যুদ্ধ হচ্ছে না !

বহুদূর থেকে ফ্রন্টের গর্জন আসে। কুটিরের দেওয়াল কেঁপে ওঠে।

ক'দিন ধরে খুব সাজ-সরঞ্জাম আসবাব-পত্র মাজা-ঘষা ঝাড়া-ঝোড়া চলেছে। যা কিছু ছেঁড়াখোঁড়া আছে তার বদলে নতুন জিনিস দেওয়া হচ্ছে। একটা গুজব শুনছি, শান্তি স্থাপন হবে, কিন্তু অন্য গুজবটাই খুব সম্ভব সত্যি—আমরা নাকি রাশিয়া যাচ্ছি। কিন্তু রাশিয়া যাচ্ছি তো এই সব নতুন জিনিস আমাদের দেবার দরকার কি ? অবশেষে খবরটা প্রকাশ হয়—সম্রাট কাইজার আমাদের দেখবার জন্যে আসছেন। সেই জন্যে অফিসারদের চটক ভেঙেছে।

আট দিন ধরে এত কসরত এত কুচ্‌কাওয়াজ হয় যে মনে হয় আমরা যেন শহরের ক্যাম্পে রয়েছি। সকলেই খিট্‌খিটে হয়ে ওঠে, এ সব আমাদের ভালো লাগে না।

অবশেষে সময় উপস্থিত হয়। আমরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াই, কাইজার দেখা দেন। তিনি কেমন দেখতে এটা জানবার আমাদের মস্ত একটা কৌতূহল ছিল। তিনি আমাদের লাইনের সামনে দিয়ে যখন চলে গেলেন, আমি তো দেখে হতাশ হই। ছবি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল তিনি আরো বড়ো, আরো জোয়ান চেহারার মানুষ হবেন, তা ছাড়া গলার আওয়াজ হবে বজ্রগম্ভীর!

তিনি লোহার ক্রুশ বিলি করেন, এর-ওর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলেন, তারপর আমরা কুচ করে চলে যাই।

পরে আমাদের এই নিয়ে আলোচনা হয়। ইয়াডেন বলে—"তাহলে ইনিই হচ্ছেন সবার বড়ো। যে যেখানে আছে সকলকে এঁর সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াতে হবে?" তারপর একটু ভেবে বলে—"সেনাপতি হিণ্ডেনবুর্গও তো? তাঁকেও তো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াতে হবে?"

কাট্‌ বলে—"নিশ্চয়ই।"

ইয়াডেনের কথা তখনও শেষ হয়নি। সে আবার একটু ভেবে বলে—"সম্রাটের সামনে একজন রাজাকেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় তো?"

আমাদের কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে তা নয়! দুজনেই উপরওয়ালা—সুতরাং আমাদের মতো এই রকম আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াবার কোনো কড়াক্কড়ি নিয়ম না-থাকারই কথা।

কাট্‌ বলে—"কি সব বাজে বকছ? আসল কথা হচ্ছে তোমাকে নিজেকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াতে হয়!"

দেখি ইয়াডেনের মুখে আজ খই ফুটছে। সে বলে—"দেখ, আমার মনে হচ্ছে আমরা যে ভাবে মাঠ সারি, সম্রাট কাইজার বোধ হয় তেমন ভাবে মাঠ সারেন না!"

কাট্‌ বলে—"কাছাকে কাছা, কাছা দু'গুণে গামছা। তোর বুদ্ধির

গোড়ায় গুবরে পোকা লেগেছে! যাও বাবা, চট করে মাঠ সেরে বুদ্ধি পরিষ্কার করে এসো।"

ইয়াডেন চলে যায়!

আলবের্ট বলে—"আমি জানতে চাই যদি কাইজার বলতেন—'না,' তাহলে এত বড় যুদ্ধটা হত কিনা।"

আমি বলি—"আমি বেশ ভালোই জানি তিনি গোড়া থেকে এর বিপক্ষে ছিলেন।"

—"বেশ, তাঁব একলার কথা না হয ছেড়েই দাও, যদি এই পৃথিবীর কোনো বিশেষ পঁচিশ কি ত্রিশ জনে বলত—'না' ?"

আমি বলি—"সেটা সম্ভব বটে। কিন্তু তাঁরা যে ভীষণ ভাবে বলেছিলেন —'যুদ্ধ হোক' !"

ক্রোপ্ বলে চলে—"ভাবতে গেলে ভারি অদ্ভুত ঠেকে, আমবা এখানে আমাদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করছি; ফরাসিরা ওখানে ওদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করছে। এখন, কারা ঠিক কাজ করছে ?"

আমি কিছুই না ভেবেই বলি—"সম্ভবত দু'দলেই।" আলবের্ট বলে— "বেশ—দেখ, আমাদের দেশের প্রফেসাব, পাদ্রি, খবরের কাগজ বলে আমরাই একমাত্র ঠিক কাজ কবছি; আবাব ফরাসিদের প্রফেসারবা, পাদ্রিরা, খবরের কাগজ-ওয়ালারা বলে, তারাই ঠিক পথে চলেছে। এখন এর কি জবাব দাও ?"

আমি বলি—"তা জানিনে। কিন্তু যাই হোক, যুদ্ধ সে তো আব থামেনি, সে রযেইছে, আর প্রতি মাসেই একের পর এক দেশ জড়িয়ে পড়ছে।"

ইয়াডেন ফিরে আসে। এখনও তার মন চঞ্চল হযে আছে। আমাদের কথাবার্তায় যোগ দিয়ে বলে—"আচ্ছা, যুদ্ধ যে হয, তাব সূত্রপাতটা কি ?"

আলবের্ট গুরুগম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলে—"যখন একটা দেশ অন্য দেশকে অপমান করে।"

ইয়াডেন বোকার মতো ভাব দেখিয়ে বলে—"দেশ! আমি বুঝতে পারছি না। জার্মানির একটা পাহাড় ফ্রান্সের একটা পাহাড়কে অপমান করতে পারে, না এখানের একটা ধানক্ষেত ওখানের একটা নদীকে কি বনকে—এ কি হয়?"

ক্রোপ্ বলে—"তুই যে বোকা সেজেছিস দেখছি। আমি বলছিলুম, এদের মানুষরা যখন ওদের মানুষদের মর্যাদাহানি করে—"

ইয়াডেন বলে—"তাহলে বাবা আমি এখানে কেন মরতে এসেছি? আমার তো কেউ মানহানি করেনি।"

আলবের্ট বলে—"তোর মতো হা-ঘরের কথা কে বলছে!"

ইয়াডেন বলে—"তবে আমি সোজা গাঁয়ে ফিরে যাই? কি বলো?"

আমরা সকলে হেসে উঠি!

ইয়াডেন খানিক পরে বলে—"তাহলে ঠিক কিসের জন্যে এই যুদ্ধটা হচ্ছে?"

কাট্ বলে—"নিশ্চয় এর মধ্যে কেউ কেউ আছে যাদের কাছে যুদ্ধটা ভারি দরকারি।"

ইযাডেন বলে—"আরে ভাই, আমি তো তাদের কেউ নই, তারাও আমার কেউ নয়।"

—"তুমিও নও, এখানকার আর কেউও নয়।"

ইয়াডেন বলে—"তবে তারা কারা? কাইজারের এতে কোনো লাভ নেই। তাঁর তো কিছুরই অভাব নেই।"

কাট্ বলে—"তা ঠিক বলা যায় না। তাঁর রাজ্যে এ পর্যন্ত কখনও যুদ্ধ হয়নি। প্রত্যেক সম্রাটেরই একটা করে যুদ্ধ করা দরকার, তা নৈলে তাঁদের নাম হয় না, ইস্কুলের ইতিহাসের বই দেখলেই প্রমাণ পাবে।"

ডেটেরিং বলে—"আর বড়ো বড়ো সেনাপতিগুলোও নাম করে।"

কাট্ বলে—"নাম করে বলে নাম করে, সম্রাটের চেয়েও বেশি নাম করে নেয়।"

ডেটেরিং বলে—"তা ছাড়াও এর পিছনে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা যুদ্ধ লাগলে বেশ কিছু সংস্থান করে নেন।"

আলবের্ট বলে—"আমার মনে হয় জ্বর-বিকারের মতো যুদ্ধ একটা রোগ এদের। কেউই একে চায় না, অথচ হঠাৎ কেমন করে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় এসে যায়। আমরা কেউই চাইনি যুদ্ধ হোক, অপর সকলেও সেই কথা বলে, অথচ আধখানা পৃথিবী এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।"

আমি বলি—"কিন্তু. আমাদের চেয়ে অপর পক্ষ মিছে কথা বলে বেশি। সেই সব বইগুলোর কথা ভাব দেখি—যাতে ওরা লিখেছে যে আমরা বেলজিয়ামে ছোটো ছোটো ছেলে ধরে ধরে খেয়েছি! যারা এই সব লেখে তাদের ফাঁসিতে লট্‌কে দেওয়া উচিত—আসল বদমাস্ তারা।"

ম্যুলের বলে—"জার্মানিতে না হয়ে যুদ্ধটা যে এদের এখানে হয়েছে এ তবু ভালো। ঐ গাড়াগুলোর দিকে একবার দেখো দেখি।"

ইয়াডেন বলে—"ঠিক! কিন্তু মোটেই যুদ্ধ না হলে আরও ভালো হত।"

আলবের্ট ঘাসের উপর শুয়ে রাগের ভাব দেখিয়ে বলে—"সবচেয়ে ভালো হয় এই সব বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করা।"

না-চাইতে আমরা যে সব নতুন নতুন উর্দি-টুর্দি পেয়েছিলুম তা প্রায় সবই ফিরিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের পুরোনো কাপড়চোপড় ঘুরে পাই। নতুনগুলো পরতে হয়েছিল কেবল লোক দেখাবার জন্যে।

রাশিয়ায় না গিয়ে আমরা আবার লাইনে যাই। পথে একটা ভেঙে-পড়া বন চোখে পড়ে—গাছগুলোর ডাল-পালা ছিঁড়ে উড়ে গেছে, মাটিও যেন চষে ফেলেছে!

শত্রুদের অবস্থিতি জানাবার জন্যে একটা দলকে পাঠানো হবে। আমার ছুটির পর থেকে বিপক্ষের লোকদের প্রতি আমার একটা অদ্ভুত টান হয়েছে। কাজেই আমিও সেই দলে যোগ দি। রাত্রে অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে গুড়ি মেরে আমাদের যেতে হবে। একটা কার্যপদ্ধতি ঠিক করে তারের বেড়া গলে পৃথক হয়ে প্রত্যেকে এক-এক দিকে চলে গেলুম। কিছুক্ষণ পরে আমি একটা ছোটো গাড়া পেয়ে তার মধ্যে নেমে পড়লুম। এখান থেকে উঁকি মেরে আমি সামনের দিকে দেখতে থাকি।

অল্প-স্বল্প মেশিন-গানের গুলি চলেছে। চারিদিক থেকেই গুলি আসছে, খুব বেশি নয়, কিন্তু সব সময়েই সতর্ক থাকতে হয়।

একটা প্যারাসুটের আলো আকাশে উঠল! পাণ্ডস্ আলোয় সমস্ত শূন্য মাঠটা চোখে পড়ে, তার পরই গাঢ়তর অন্ধকারে সব ঢেকে যায়। ট্রেঞ্চে আমাদের জানানো হয়েছে যে আমাদের সামনে "কালা পল্টনরা" আছে। এটা শুনে বড়ো বিশ্রী লেগেছে; অন্ধকারে তারা মিলিয়ে থাকে, তা ছাড়া পাহারার কাজে তারা খুব ওস্তাদ! মজা হচ্ছে, বেশির ভাগ তারা বোকা হয়। একদিন তাদের একজন প্রহরী উৎসাহের চোটে সিগারেট মুখে দিয়েই মাঠের মধ্যে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। কাট্ আর ক্রোপ্ সেই জ্বলন্ত সিগারেটের মুখটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তেই কর্ম কাবার!

আমার কাছাকাছি একটা বোমা না কি এসে পড়ল। সেটা যে আসছে তা আমি শুনতে পাইনি। আমি ভয় পেয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে একটা অকারণ ত্রাস আমায় পেয়ে বসে। এইখানে আমি একলা

অসহায় ভাবে অন্ধকারে পড়ে রয়েছি—কে জানে হয়তো সামনের কোনো গর্ত থেকে একজোড়া চোখ অনেকক্ষণ ধরে আমায় লক্ষ্য করছে, আমাকে ধুলো করে উড়িয়ে দেবার জন্যে একটা বোমাও হয়তো তৈরি আছে। আমি মনটাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করি। এই যে নজর রাখার কাজ আমার প্রথম তা নয়, বা এটা খুব বিপদসঙ্কুল তাও নয়। আসলে এটা হচ্ছে আমার ছুটির পর প্রথম, আর এখানকার জমিটাও আমার অচেনা।

আমি মনে মনে বলি, মিছে ভয় পাচ্ছি, আমার সামনে কিছুই নেই, কেউই অন্ধকারের মধ্যে আমার দিকে চোখ রাখেনি, তা নৈলে বোমাটা ঐ রকম নিচু হয়ে এসে পড়ত।

আমার মাথার ভাবনা-চিন্তাগুলো গোলমাল হয়ে জট পাকিয়ে যায়—আমি আমার মা'র সতর্কতার বাণী শুনতে পাই, দেখতে পাই, ফুরফুরে দাড়ি নিয়ে রাশিয়ানরা তারের বেড়া ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কল্পনায় ভয়ের ছবি দেখে আঁৎকে উঠি। মনে হয় যে-দিকে আমি মাথা ঘোরাচ্ছি সেই দিক থেকেই একটা মসৃণ চকচকে বন্দুকের নল আমার দিকে লক্ষ্য করে রয়েছে। সমস্ত দেহ আমার ঘেমে ওঠে।

তবু আমি আমার ছোটো গর্তটার মধ্যে শুয়ে থাকি। ঘড়িতে দেখি সামান্য কয়েক মিনিট কেটেছে। আমার কপাল ভিজে গেছে, হাত কাঁপছে, আমি হাঁপাচ্ছি—তাও অতি ধীরে। কিছুই না, কেবল একটা ভয়ের আক্রমণ—এখান থেকে মাথাটা বার করে বাইরে যাবার ভয়!

আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম, কেবলমাত্র এইখানটিতে শুয়ে থাকবার ইচ্ছার মধ্যে ফেনার মতো আস্তে আস্তে তলিয়ে যায়।

আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন মাটির সঙ্গে জুড়ে গেছে। চেষ্টা করেও

হাত-পা ছাড়াতে পারিনে। আমি মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকি, সামনে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। স্থির করি এখানেই আমি শুয়ে থাকব।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার উপর দিয়ে একটা নতুন তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে যায়। লজ্জায় গ্লানিতে মিশ্রিত একটা তরঙ্গ! আমি চারিদিকে দেখে নেবার জন্যে একটুখানি উঠলুম। অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণে চোখ মেলে থাকি। একটা তারাবাজি আকাশে ওঠে—আমি আবার নিচু হই।

আমি নিজেকে গঞ্জনা দি—এই ভয়-টয় এ সমস্ত এই ছুটি নেওয়ার ফল। কিন্তু নিজের মনকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনে, দেহ অবশ হয়ে আসে। আমি ধীরে ধীরে একটু উঠে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখি, তারপর কোনো রকমে গর্তের কিনারায় এসে দেহটাকে টেনে আধখানা বার করি।

কিসের একটা শব্দ, কানে যায়, চকিতের মধ্যে গুটি মেরে পড়ি। সন্দেহজনক শব্দ, গোলাবর্ষণের ধ্বনির মধ্যে থেকেই বেশ স্পষ্ট শুনতে পাই। কান খাড়া করে শুনি—মনে হয় যেন পিছন থেকে শব্দটা আসছে। ও, আমাদেরই ট্রেঞ্চ থেকে শব্দ আসছে। চাপা গলার আওয়াজ শুনে বোধ হয় কাট্ কথা কইছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা নতুন জীবন প্রবাহিত হয়ে যায়। যে ভীষণ নির্জনতা, যে মৃত্যুভয় আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল, এই শব্দটুকু মুহূর্তের মধ্যে তা দূর করে দেয়। এই শব্দ আমার কাছে প্রাণের চেয়ে, মাতৃস্নেহের চেয়ে, ভয়ের চেযে বড়ো—এ হচ্ছে আমার সঙ্গীদের সাড়া!

আমি আর অন্ধকারে একা নই—আমি ওদের মধ্যে আছি। ওরাও আমার সঙ্গে আছে, আমরা সকলেই একই ভয় একই জীবন সমানে

ভাগ করে নিয়েছি। ওদের শব্দ—ওদের কথা আমায় বাঁচিয়েছে, আমার পাশে পাশে ওরা থাকবে।

সাবধানে আমি বার হয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলি। চারিদিকে লক্ষ্য রেখে চলি, যাতে এই পথে আবার ফিরে যেতে পারি। তারপর শত্রুপক্ষের সন্ধান পাবার চেষ্টা করি।

এখনও আমার ভয় যায়নি—কিন্তু এ অবোধের ভয় নয়, একটা প্রখর সতর্কতা! এলোমেলো বাতাস বইছে, গোলা-ফাটার আভায় মাঠের উপর ছায়াগুলো হেলছে দুলছে। সামনের দিকে প্রাণপণে চেয়ে দেখছি—কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে না। কাজেই সামনের দিকে অনেকটা গিয়ে একটা বড়রকম গণ্ডি টেনে ফিরতে থাকি। শত্রুপক্ষের সন্ধান কিছুই পেলাম না। যত আমাদের ট্রেঞ্চের কাছে আসতে থাকি, ততই আমার সাহস বাড়তে থাকে—তাড়াতাড়ি চলতে থাকি—এখন পথ হারিয়ে গেলে বড় মুশকিল হবে।

তারপর একটা নতুন ভয় আমাকে পেয়ে বসে। আমার যেন দিগ্‌ভ্রম হয়ে যায়। একটা গর্তের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আমি দিক্‌নির্দেশ করবার চেষ্টা করি। এমন বহুবার ঘটেছে যে কোনো সৈনিক আনন্দে ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়বার পর আবিষ্কার করেছে যে সেটা শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চ।

কিছুক্ষণ পরে আমি শব্দ শুনতে পাই—কিন্তু খুব নিশ্চিত হতে পারি না। চারিদিকের রাশিরাশি গোলার গর্তগুলো এমন গোলমেলে ঠেকতে থাকে যে কোন দিকে আমি যাব ঠিক করতে পারি না। কে জানে হয়তো আমি আমাদের ট্রেঞ্চের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছি, এমনি করে কি চিরকাল চলতে থাকব? কাজেই আবার মোড় ফিরে চলি।

আঃ, এই হাউইগুলো জ্বালাতন করেছে। যেন ঘণ্টাখানেক ধরে এক একটা জ্বলতে থাকে—নিভতে আর চায় না! সে সময় একটু নড়াচড়া করলেই কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে একটা গুলি বেরিয়ে যাবে।

ভয়ে ভয়ে আমি পথ করে চলি। কাঁকড়ার মতো বুকে হেঁটে চলতে হয়, ক্ষুরধার গোলার কুচিতে প্রায় হাত কেটে যায়। থেকে থেকে মনে হয় দিক্‌প্রান্ত যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে। কিন্তু ভ্রম—ও কল্পনা মাত্র! আমি বেশ বুঝতে পারি ঠিক দিকনির্ণয় করে চলার উপর আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

দুম্ করে একটা গোলা ফাটে। প্রায় উপরি উপরি আরও দুটো। তারপর একেবারে রীতিমতো শুরু হয়ে যায়। মেশিন-গান গর্জে ওঠে। এখন এখানে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার উপায় নেই। খুব সম্ভবত একটা আক্রমণ আসছে। চারিদিক থেকে অবিরাম হাউই ছুটতে থাকে!

আমি একটা প্রকাণ্ড গাড়ার মধ্যে গুড়ি মেরে পড়ে থাকি। আমার কোমর পর্যন্ত কাদা জলে ডোবানো। ভিজে মাটির মধ্যে যত গভীর ভাবে পারি আমার মুখ লুকোই, কেবল যাতে দম বন্ধ হয়ে না যায়। আমায় মরার ভান করে পড়ে থাকতে হবে।

হঠাৎ শুনতে পাই 'বারাজ'এর পাল্লা চড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি অবিলম্বে একগলা জলের মধ্যে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে কেবল নিঃশ্বাস নেবার জন্যে মুখটুকু বার করে টোপ দিয়ে মাথা ঢেকে বসে থাকি।

আমি স্থির হয়ে থাকি। কোথায় যেন একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ পাই, তারপর কি যেন একটা ছপ্ ছপ্ করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আমার হাত-পা বরফের মতো হিম হয়ে আসে। আমার গর্তটার উপর দিয়ে তড়্‌বড়্ শব্দ ক্রমে দূরে চলে যায়। আক্রমণের প্রথম ঢেউটা চলে গেল। আমার মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা—যদি

এই গর্তের মধ্যে কেউ লাফিয়ে পড়ে তো কি করা যাবে ? তাড়াতাড়ি আমি আমার ছোট্ট ছোরাখানা বার করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরি। যদি কেউ এখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ আমি তার গলায় ছুরি বসিয়ে দেব—যাতে চীৎকার করে ডাকতে পর্যন্ত না পারে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সে যখন এর মধ্যে এসে পড়বে, আমারই মতো তখন সেও ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে। দুজনে মুখোমুখি হবার আগেই আমি তাকে প্রথম বসিয়ে দেব।

এইবার আমাদের কামানের দল গোলাবর্ষণ করতে শুরু করলে। একটা গোলা আমার কাছাকাছি এসে পড়ে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়—শেষে কিনা নিজেদের গোলাতে নিজেকে মরতে হবে ? আমি গালি দিতে দিতে কাদার মধ্যে দাঁত কড়মড় করতে থাকি।

গোলার শব্দে কান যেন কালা হয়ে যায়। এখন যদি আমাদের দল ফিরতি আক্রমণ করে তো আমি বেঁচে যাই।

মেশিন-গান ডেকে ওঠে। আমি জানি আমাদের কাঁটাতারের বেড়া বেশ দৃঢ় এবং অক্ষত আছে—জায়গায় জায়গায় প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত করা। রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ বেড়ে ওঠে। শত্রুরা এগোতে পারেনি, ওদের হটে যেতে হবে।

আবার আমি জলের মধ্যে ডুবে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকি। খটাখট্ ঝন্ ঝন্ শব্দ ক্রমে স্পষ্টতর হতে থাকে। একটা সকরুণ চীৎকার শোনা যায়। আক্রমণকারীরা হটে গেছে।

অল্প একটু আলো হয়ে আসছে। আমার মাথার উপর দিয়ে চট্পট্ হটে আসার পায়ের শব্দ শুনতে থাকি। প্রথম কে একজন চলে গেল। তারপর আর একজন। মেশিন-গান শব্দ দিচ্ছেই। যেমন আমি এক

পাশে ফিরতে যাব একটা কি ভারি জিনিস হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে গড়াতে গড়াতে গর্তের মধ্যে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল।

আমি আর একটুও চিন্তা একটুও দ্বিধা করিনে। সঙ্গে সঙ্গে খ্যাপার মতো যেখানে সেখানে দো-চোখো ছোরা বসাতে থাকি। যখন সামলে উঠি, আমার হাত রক্তে চিট্‌চিট্‌ করছে।

লোকটা গোঁ গোঁ করতে থাকে। আমার মনে হয় সে যেন চীৎকার করছে; এক একটা খাবি খায় আর মনে হয় যেন এক একটা চীৎকার—বজ্রধ্বনির মতো! আমি মাটি চাপা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিতে চাই, আবার ওকে ছুরি মারতে চাই, ওকে চুপ করাতেই হবে—ও আমাকে ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে! অবশেষে আমি নিজেকে সংযত করে নি, কিন্তু হঠাৎ এত দুর্বল হয়ে পড়ি যে ওর দিকে আমার হাত আর কোনোমতেই উঠতে চায় না।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে অপর কোণে গিয়ে ছোরা হাতে বসে রইলুম; আমার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ, সে একটু নড়লেই আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু তার আর কোনো ক্ষমতাই নেই, তার গলা ঘড়-ঘড় শুরু হয়ে গেছে।

আমি অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছি। আমার এখন একমাত্র বাসনা এখান থেকে কোনোরকমে বেরিয়ে পড়া। যদি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে না পারি, বড় বেশি আলো হয়ে পড়বে। আমি মাথাটা একটু উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করি। এখন যাওয়া অসম্ভব। যে রকম ভাবে মেশিন-গানের গুলি মাঠ ঝেঁটিয়ে চলেছে তাতে একটা লাফি দিয়ে ওঠবার আগেই আমি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাব।

একবার আমার ইস্পাতের টোপটা হাতে করে একটু তুলে দেখতে যাই কত নিচু দিয়ে গুলি যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলির ঘায়ে টোপটা আমার হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে যায়। মাটির সঙ্গে প্রায় সমান

হয়ে গুলি ছুটছে। আমি শত্রুদের লাইন থেকে খুব যে দূরে আছি তা নয়; যদি এখন বেরতে যাই তো ওদের যে-কোনো দূরন্দাজ অনায়াসে আমায় গুলি করে মারবে।

ক্রমে আরও আলো হয়। অতিষ্ঠ হয়ে আমি আমাদের তরফ থেকে আক্রমণের অপেক্ষা করি।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়। গহ্বরের মধ্যে যে অন্ধকার মূর্তিটা পড়ে আছে তার দিকে আর তাকাতে আমার সাহস হয় না। তার দিক থেকে কোনোমতে চোখ ফিরিয়ে আমি বসে থাকি।

শোঁ শোঁ করে গুলি চলতে থাকে—সারা মাঠের উপর দিয়ে যেন একটা ইস্পাতের অফুরন্ত জ্বলন্ত জাল বোনা হচ্ছে।

তারপর হঠাৎ আমার রক্তমাখা হাতটা চোখে পড়ে, গা বমি বমি করে উঠে। মাটি দিয়ে ঘষে ঘষে রক্তের দাগ মুছে ফেলি।

গুলিবর্ষণ কমে না—দুদিক থেকে সমান চলেছে। আমাদের দলের লোকেরা হয়তো আমি মরে গেছি ভেবে বহুক্ষণ আমার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

সকাল হয়েছে, পরিষ্কার সকাল। আহত লোকটার ঘড়-ঘড় শব্দ চলতেই থাকে; আমি কান ঢেকে ফেলি, কিন্তু তখনই আবার খুলে ফেলতে হয়, তা না হলে অন্য শব্দও শুনতে পাইনে।

লোকটা আমার সামনে পড়ে রয়েছে, একটু একটু নড়ছে। ইচ্ছে না থাকলেও সেদিকে একবার তাকাই, তারপর চোখ আর নড়ে না, ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা একজন মানুষ, তার মাথা একপাশে হেলে পড়েছে, একটা হাত আধবাঁকা অবস্থায়, অন্য হাতটা তার বুকের উপর রক্তাক্ত!

আমি মনে মনে বলি—ও মরে গেছে, নিশ্চয় মরে গেছে, সব রকম অনুভূতি ওর লোপ পেয়েছে, ওর দেহটা কেবল ঘড় ঘড় করছে। তারপর সে মাথাটা একটু ওঠাবার চেষ্টা করে, ঘড়-ঘড় শব্দটা স্পষ্টতর হয়, হাতের উপর মাথাটা গুজড়ে পড়ে। লোকটা এখনও মরেনি, মর-মর হয়েছে। আমি তার দিকে এগিয়ে যাই—পা যেন চলতে চায় না। সে তিন গজ মাত্র তফাতে পড়ে আছে, কিন্তু এই তিন গজ মনে হয় যেন কত দূর! শেষে আমি তার পাশে গিয়ে পড়ি।

সে চোখ মেলে চায়—আমার আসার শব্দ বোধ হয় শুনতে পেয়েছে! আমার দিকে বিষম একটা ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে দেখে। দেহটা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু চোখে এমন একটা অসাধারণ পলাতকের ভাব আঁকা হয়ে রয়েছে যে দেখে হঠাৎ মনে হয় ঐ দৃষ্টিটার এত শক্তি আছে যে দেহটাকে শুদ্ধ সে শত শত মাইল টেনে নিয়ে পালাতে পারে। লোকটার কোনো সাড়াশব্দ নেই, সম্পূর্ণ নিশ্চল, গলার ঘড়-ঘড় শব্দ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু চোখ যেন চীৎকার করছে! পালিয়ে যাবার একটা প্রচণ্ড চেষ্টা, মৃত্যুর এবং আমার ভয়, ওর সমস্ত প্রাণ-শক্তিটা যেন ঐ দুটো চোখের মধ্যে এসে জড়ো হয়েছে।

আমি বসে পড়ে কনুইএ ভর দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলি—"ভয় নেই, ভয় নেই!"

তার দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করে। যতক্ষণ সে ঐ রকমভাবে তাকিয়ে থাকবে আমার পক্ষে নড়া অসম্ভব।

তারপর ধীরে ধীরে তার বুক থেকে হাতটা পড়ে যায়, তার চোখের দৃষ্টি সামান্য একটু কোমল হয়, আমি ঝুঁকে পড়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলি—"ভয় কি? ভয় কি?"

আমি যে তাকে সাহায্য করতে চাই এটা আমায় দেখাতে হবে—আমি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকি। তারপর তার সেই বদ্ধদৃষ্টি

কোমল হয়ে আসে, চোখের পাতা নিচু হয়, তার উদ্বেগ কেটে যায়। আমি তার গলাটা খুলে তার মাথাটা আরাম করে ঠেস্ দিয়ে দি।

সে মুখ খুলে কথা বলবার চেষ্টা করে। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে। আমার জলের বোতলটা আমি সঙ্গে আনিনি, গর্তের মধ্যে যে জল আছে তা কাদা গোলা। আমি নিচে নেমে গিয়ে আমার রুমাল বার করে উপরের ময়লাগুলো সরিয়ে দিয়ে খানিকটা হল্‌দে রঙয়ের জল তুলে নিয়ে আসি। সে সেটা পান করে। আমি আরও খানিকটা আনি। তারপর আমি তার জামা খুলে তার ক্ষত বাঁধবার চেষ্টা করি। এটা আমাকে করতেই হত, কারণ যদি শত্রুদের হাতে আমি ধরা পড়ি ওরা দেখবে যে আমি ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, সুতরাং আমাকে ওরা গুলি করে মারবে না। ও বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু ওর হাত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। জামাটা রক্তে এঁটে গেছে, উঠতে চায় না; বোতামগুলো পিঠের দিকে, কাজেই কেটে ফেলা ছাড়া উপায় নেই।

আমি ছুরিটা বার করে যখন কাটতে যাই তার চোখ দুটো আবার বড়ো বড়ো হয়ে খুলে যায়, ছুরি দেখে বেচারা ভয় পায়। আমি তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে বার বার বলতে থাকি—"আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, কমরেড—কমরেড—কমরেড—" বার বার ব্যগ্রভাবে বলতে থাকি যাতে সে বুঝতে পারে।

আমার কাছে যা ব্যাণ্ডেজ ছিল তাই দিয়ে ছুরির তিনটে চোট ঢেকে দি। তার তলা দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমি চেপে ধরতে সে গোঙিয়ে ওঠে। এ ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না। এখন আমাদের কেবল অপেক্ষা করতে হবে।

কি করেই যে ঘন্টার পর ঘণ্টা যাচ্ছে! আবার সেই গলার ঘড়

ঘড় শব্দ শুরু হয়—ওঃ একটা মানুষ মরতে কতখানি সময় নেয়! আমি জানি ওকে বাঁচানো যাবে না ; যদি মাঠে ঘোরবার সময় আমার রিভল-ভারটা হারিয়ে না ফেলতুম তো ওকে আমি গুলি করতুম। আবার ছুরি বসানো ?—সে আমি পারব না।

দুপুর বেলা খিদেয় আমার পেট জ্বলে যায়। এক টুকরো খাবারের জন্যে আমি চোখের জল ফেলি। মুমূর্ষুর জন্যে বার বার আমি জল আনি, নিজেও কিছু পান করি।

এই আমি প্রথম নিজের হাতে এমন একটা মানুষ মারলুম যে আমার চোখের সামনে মরছে। কাট্, ক্রোপ্, ম্যুলের, ওদের ইতিপূর্বেই এ অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে—হাতাহাতি যুদ্ধে অনেকেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করে। বেলা প্রায় তিনটের সময় সে মারা গেল।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। গোঙানির শব্দের চেয়ে নিস্তব্ধতাটা যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠল।

আমি একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলুম—কি করব, কিছু কাজ আমায় করতেই হবে। যদিও সে আর কিছু অনুভব করছে না, তবু আমি তার মাথাটা বেশ করে গুছিয়ে আরাম করে শুইয়ে দিলুম ও তার চোখ বন্ধ করে দিলুম।

ওর স্ত্রী নিশ্চয়ই এখনও ওর কথা ভাবছে। কি যে ঘটেছে সে এখনও জানে না। একে দেখে মনে হচ্ছে প্রায়ই ওর স্ত্রীকে চিঠি লেখা অভ্যাস ছিল। ডাকগাড়িতে এখনও এর চিঠি তার কাছে পৌঁছতে থাকবে—হয়তো কোনোটা কাল, কিংবা এক সপ্তার মধ্যে, হয়তো একখানা পুরোনো চিঠি হঠাৎ মাসখানেক বাদে। ওর স্ত্রী যখন সেই চিঠি পড়বে, সেই চিঠির মধ্যে ও স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইবে!

নাঃ আমার দশা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে—আমি আমার বুদ্ধিকে ঠিক রাখতে, চিন্তাকে সংযত করতে পারছি না!

যদি আমি আমাদের ট্রেঞ্চে ফিরে যাবার রাস্তাটা ভালো করে মাথার মধ্যে রাখতে পারতুম তাহলে এই লোকটা হয়তো আরো ত্রিশ বছর বাঁচতে পারত। যদি সে এই গর্তটা থেকে আর দুগজ তফাৎ দিয়ে দৌড়ে যেত তো এতক্ষণে সে তাদের ট্রেঞ্চে ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে আর একটা নতুন চিঠি লিখতে পারত।

থাক—এ রকম করে ভাবলে আর চলবে না। সেপাইদের কপালটাই ঐ রকম। ধরো কেমেরিখের পা-খানা—যেখানে গুলিটা পড়ল তার থেকে আর ছ'ইঞ্চি ডাইনেও তো থাকতে পারত! হাইএ ভেস্টুস—সে যদি আর তিন ইঞ্চি সামনের দিকে পিঠ ঝুঁকিয়ে বসে থাকত!

ক্রমে চারিদিক স্তব্ধ হয়ে আসছে। নিজে বক্‌বক্‌ করে চলা ছাড়া আর উপায় কি? আমি সেই লোকটার কাছে গিয়ে বলি—"কমরেড, আমি তোমায় মারতে চাইনি। যদি তুমি আবার এখানে ঝাঁপিয়ে পড় তো আমি ছুরি তুলব না। তুমি আমার কাছে ছিলে একটা কি তো কি—নিছক একটা কল্পিত—তাকেই আমি ছুরি মেরেছি। কিন্তু এখন আমি এই প্রথম দেখছি তুমিও আমারই মতো মানুষ। ছুরি মারবার আগেই আমি ভেবেছিলুম তোমার বোমা, তোমার সঙিন, তোমার বন্দুকের কথা—এখন স্পষ্ট দেখছি তোমার মুখ, যেন তোমার স্ত্রীরও মুখ দেখছি, এবং দেখছি তুমি আমি দুজনে দুজনের বন্ধু! আমায় ক্ষমা কর, কমরেড—অনেক বিলম্বে আমাদের চোখ ফোটে। কেন ওরা আমাদের বলে না যে তোমরাও আমাদেরই মতো হতভাগ্য, তোমাদের মায়েরাও আমাদের মায়েদের মতো ভাবনায় ভাবনায় কাল কাটান; আমাদের মৃত্যুর ভয় দুজনেরই সমান, মৃত্যুর-যন্ত্রণাও এই রকম। ক্ষমা কর, কমরেড! তুমি আমার শত্রু হবে কেমন করে? যদি আমরা এই

বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সৈনিকের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াই, তাহলে কাট্‌ আর আলবের্ট-এর মতো তুমিও তো আমাদের একজন।

আমার জীবন থেকে কুড়িটা বছর, কি তার চেয়ে বেশি নিয়ে নাও, কমরেড, নিয়ে তুমি উঠে দাঁড়াও।

চারিদিকে নিস্তব্ধ—কেবল রাইফেলের দু একটা শব্দ আসছে। কিন্তু এখনও আলো রয়েছে, আমার ফেরবার উপায় নেই।

আমি তাকে ডেকে বলি—"আমি তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানাব আমার কাছ থেকেই সে খবরটা পাক। তোমায় যা বলেছি সব কথাই আমি তাকে বলব। তাকে আমি দুঃখ পেতে দেব না। তাকে, তোমার বাপ-মাকে, তোমার ছেলে-পিলেদের আমি খবরদারি করব—"

ওর জামাটা আধখানা খোলা। পকেট বইটা সহজেই পাওয়া গেল। কিন্তু সেটা খুলতে আমি ইতস্তত করি। এতে তার নাম লেখা আছে। যতক্ষণ না আমি তার নাম জানছি, হয়তো ওকে ভুলে যেতে পারব। কালের স্রোতে এ ছবি মুছে যেতে পারে। কিন্তু তার নাম যদি জানি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা গজালের মতো গেঁথে যাবে, আর টেনে বার করা সম্ভব হবে না। চিরকালের মতো নামটা মনে থাকবে, জীবনের পথে চলতে চলতে থেকে থেকে মনে পড়ে যাবে।

হঠাৎ আমার হাত থেকে খসে খাতাটা খুলে পড়ে যায়। কয়েকখানা চিঠি আর ছবি ছড়িয়ে পড়ে আমি সেগুলোকে গুছিয়ে তুলে নি।

একটা আইভি-লতা ঢাকা দেয়ালের সামনে একটি স্ত্রীলোক আর একটি বালিকার ফটোগ্রাফ। চিঠিগুলো বার করে আমি পড়বার চেষ্টা করি, কিন্তু বেশির ভাগই বুঝতে পারি না—ফরাসি ভাষা আমার ভালো

জানা নেই। কিন্তু যে ক'টি শব্দ আমি তর্জমা করতে পারি তারা যেন ছুরির আঁচড়ের মতো আমার বুকে বসে যেতে থাকে।

বেশ বুঝতে পারি, ওদের কাছে যে চিঠি লিখব ভেবেছিলুম তা আর আমি পারব না—অসম্ভব! আর একবার ছবিগুলোর দিকে চেয়ে দেখি। ওরা বড়লোক নয়। যদি আমি ভবিষ্যতে কিছু রোজগার করি, ওদের কাছে বেনামী খরচ-খরচা পাঠিয়ে দেব। এই চিন্তাটা আমায় পেয়ে বসে।

ধীরে ধীরে বইটা খুলে পড়ি—জেরার্ড ডুভাল্—কম্পোজিটার।

তারই পেন্সিল দিয়ে আমি একটা খামের উপর তার ঠিকানাটা টুকে নিয়ে তারপর তাড়াতাড়ি সব জিনিস তার জামার মধ্যে রেখে দি।

ছাপাখানার জেরার্ড ডুভালকে আমি খুন করেছি—এলোমেলো ভাবে আমার মাথার মধ্যে এই ভাবনা আসে যে ছাপাখানায় আমায় কাজ নিতেই হবে।

বেলা পড়ে এলে আমি খানিকটা ঠাণ্ডা হই। আমার ভয় মিছে। নামটা আর আমার মাথার মধ্যে ঘোরে না। মৃত লোকটিকে আমি শান্ত স্বরে বলি, "আজ তুমি গেলে, কাল আমি যাব, কিন্তু কমরেড, কোনোরকম করে যদি নিষ্কৃতি পাই এই যুদ্ধের হাত থেকে, তবে আমাকে লড়তেই হবে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে যা আমাদের দুজনকেই মেরে রেখে গেল—এ-ভাবে নয় ও-ভাবে। আমি শপথ করছি, কমরেড, এ রকম কাণ্ড আর ঘটতে দিচ্ছি না।

সূর্য মাঠের পারে নেমে পড়ে। আমি সারাদিনের উত্তেজনায়, খিদেয়, এত দুর্বল, এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে মনে করি এই জায়গা থেকে আর কখনও বার হতে পারব না। ঢুলুনি আসে। প্রথমে বুঝতেই

পারি না যে সন্ধ্যা হয়ে এল। প্রদোষ ঘনিয়ে আসে, রাত্রি আসতে আর এক ঘণ্টা আছে।

হঠাৎ আমার কাঁপুনি ধরে। আমি আর মরা লোকটা সম্বন্ধে কিছু ভাবিনে। হঠাৎ বাঁচবার ইচ্ছাটা আমার মধ্যে জেগে ওঠে—বাঁচবার ভাবনা আর সব ভাবনাকে তলিয়ে দেয়।

মনে হয় যেমন আমি গুড়ি মেরে উঠব, আমাদের নিজেদের সৈন্যরাই আমার উপর গুলি চালাবে—তারা তো জানে না যে আমি ফিরছি। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি চেঁচিয়ে উঠব—যাতে আমাকে চিনতে পারে। যতক্ষণ না তারা সাড়া দেয় আমি ট্রেঞ্চের বাইরে শুয়ে থাকব!

সন্ধ্যা-তারা উঠল। ফ্রন্ট্‌টা একেবারে চুপ-চাপ হয়ে গেছে। আমি নিজের মনে বলতে থাকি—এবার আর বোকামি নয়, পাউল। ধীরে সুস্থে মন স্থির কর, তবেই তুমি বাঁচতে পারবে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আমার মনের উদ্বেগ কেটে যায়। তারপর গাড়ার মধ্য থেকে গুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মরা মানুষটার কথা আমি ভুলে গেছি। আমার সামনে রয়েছে আগতপ্রায় রাত্রি আর পরিষ্কার তক্‌তকে মাঠ। আমি একটা গোলার গাড়া দেখে রাখি, যেমন অন্ধকার হয়, আমি তার মধ্যে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ি। অন্ধকারে হাৎড়ে আরও খানিক এগিয়ে যাই, তারপর আর একটায় চলে যাই। এমনি করে একটার পর একটা গর্ত পেরিয়ে চলি। ট্রেঞ্চের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই তাদের গায়ে কি যেন একটা নড়ছে, তারপর স্থির হয়ে যায়। আবার সেটা দেখতে পাই।

হ্যাঁ, ওরাই আমাদের ট্রেঞ্চের লোক। কিন্তু যতক্ষণ না জার্মান টোপ দেখে চিনতে পারি ততক্ষণ আমার সন্দেহ যায় না। তারপর আমি চেঁচিয়ে ডাকি; সঙ্গে সঙ্গে আমার নাম ধরে কে জবাব দেয়—"পাউল—পাউল।"

আমি আবার সাড়া দি। কাট্‌ আর আলবের্ট একটা স্ট্রেচার নিয়ে আমায় খুঁজতে এল।

—"তুমি কি আহত হয়েছ?"

—"না।"

আমরা ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়ি। আমি কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে গ্রাসে গ্রাসে খেয়ে ফেলি। ম্যুলের আমাকে একটা সিগারেট দেয়। অল্প কথায় কি ঘটেছিল আমি বুঝিয়ে বলি। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, এ রকম প্রায়ই ঘটে। একবার রাশিয়াতে কাট্‌ দুদিন শত্রু-শ্রেণীর পিছনে পড়েছিল।

আমি সেই মৃত মুদ্রাকরের কথা উল্লেখ করি না। কিন্তু বেশিক্ষণ নিজের মনে চেপে রাখতে পারি না, কথাটা কাট্‌ আলবের্টের কাছে বেরিয়ে পড়ে। তারা দুজনেই আমাকে এই বলে শান্ত করতে চেষ্টা করে, "সে অবস্থায় তুমি আর কি করবে? মানুষ মারতেই তো তুমি এখানে এসেছ।"

তাদের কাছে পেয়ে, তাদের কথা শুনে, আমরা স্বস্তি পাই। গাড়ার মধ্যে আমি যা বকেছি সে সব অর্থহীন প্রলাপ!

কাট্‌ আঙুল দেখিয়ে বলে—"ঐ দিকে দেখ।" বুরুজের উপর কয়েক জন দূরন্দাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের রাইফেলের নলে একটা করে দূরবীণ আঁটা শত্রুদের ফ্রন্টের উপর তারা লক্ষ্য রেখেছে। থেকে থেকে একটা করে গুলির শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। সার্জেন্ট আউল্‌রিখের আজ বুক ফুলে গেছে—তিনটে গুলির একটাও তার ফাঁক যায়নি!

কাট্‌ বলে—"এটা দেখে কি মনে হয়?"

আমি ঘাড় নেড়ে বলি—"আমি হলে পারতুম না।"

কাট্‌ বলে—"এখানে বসে বসে মারতে তুমি দেখছ তো? নিজের হাতে মারা আর দেখা, ও একই কথা।"

সার্জেন্ট আউলরিখের নল ঘুরে ফিরে শিকার খুঁজে বেড়াতে থাকে।

আলবের্ট বলে—"যা হয়েছে তা নিয়ে মিছিমিছি ভেবে ঘুম নষ্ট করবার দরকার নেই।"

আমি বলি—"তার সঙ্গে এক জায়গায় অতক্ষণ কাটিয়েছিলুম কিনা, তাই বোধ হয় ঐ রকম হয়েছিল। যাই বল, যুদ্ধ—সে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়।"

আউলরিখের রাইফেলে চাবুকের মতো ছটাং করে একটা শব্দ করে ওঠে।

দশম পরিচ্ছেদ

কিছুদিন পরে একটা গ্রাম খালি করে দেবার জন্য আমাদের পাঠানো হয়। রাস্তায় দেখি দলে দলে গ্রামবাসীরা সব পালিয়ে চলেছে। তারা কেউ ঠেলা গাড়িতে, কেউ পিঠে করে তাদের জিনিসপত্র মোট ঘাট নিয়ে চলেছে। তাদের দেহ কুঁজো হয়ে পড়েছে, মুখের ভাব দুঃখে হতাশায় ব্যস্ততায় পূর্ণ। শিশুরা মায়ের হাত চেপে ধরেছে— তাদের কারো কারো হাতে ভাঙা-চোরা খেলনা পুতুল। কারো মুখে একটা কথা নেই! আমরা সার বেঁধে কুচ্ করে চলি। গ্রামের মধ্যে যতক্ষণ অধিবাসীরা থাকে, ফরাসিরা তার উপর গোলাবর্ষণ করে না। কিছুক্ষণ পরে আকাশ গর্জে উঠল, পৃথিবী কেঁপে উঠল। আমাদের দলের পিছনে একটা গোলা এসে পড়েছে। আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়, আমার সেই স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা যা আমায় বরাবর বিপদের সময় ঠিক পথে চালিত করেছে তা আমার মধ্যে আর নেই। হঠাৎ এই ভাবনাটা আমার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো এল—"বাস্, এইবার গেছ তুমি!" সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁ পায়ে চাবুকের মতো কিসের

একটা আঘাত এসে সপাং করে পড়ে! আলবের্টের চীৎকার শুনতে পাই—সে আমার পাশেই পড়ে আছে।

—"শিগ্গির ওঠো আলবের্ট, আমরা খোলা মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছি!"

সে উঠে দাঁড়িয়ে টল্‌তে টল্‌তে ছুটতে থাকে। আমি তার পাশে পাশে চলি। একটা গাছের বেড়া টপকে আমাদের যেতে হবে। বেড়াটা মানুষের চেয়েও উঁচু। ক্রোপ্ একটা ডাল ধরে, আমি তার পা ধরে উঁচু করে ঠেলে দি, সে ওপারে গিযে পড়ে! এক লাফে আমিও বেড়া টপকে একটা খানার মধ্যে গিয়ে পড়ি—পানাতে, কাদাতে, আমাদের মুখ ভরে যায়, কিন্তু এই খানার আড়ালটা ভালো। ময়লা জলে আমরা গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকি। যেই একটা করে গোলা সিটি দিয়ে ওঠে, আমরা সটান ডুব মারি। এমনি দশ বারো বার করবার পর আমি হাঁপিযে পড়ি।

আলবের্ট বলে—"চল বেরিয়ে যাই, ডুবে মরব শেষকালে?"

আমি তাকে বলি—"তোমার কোথায় চোট লেগেছে?"

—"বোধ হয হাঁটুতে!"

—"দৌড়তে পারবে?"

—"হযতো পারব।"

—"তবে চল।"

রাস্তার ধারে নালাটার দিকে আমরা দৌড় দি। নিচু হয়ে হয়ে সেই নালার গায়ে গায়ে ছুটতে থাকি; কামানের গোলা আমাদের পিছু নেয়। এই পথটা আমাদের গোলাবারুদের ঘর অবধি গেছে। শত্রুদের গোলা যদি আমাদের তাড়া করে বারুদের ডিপো অবধি পৌঁছয় তো এ মাঠের মধ্যে একজনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজেই আমরা মতলব বদলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি ভাবে ছুটতে থাকি।

আলবের্ট পিছিয়ে পড়তে থাকে। সে মাটিতে শুয়ে পড়ে বলে—"তুমি যাও, আমি পরে আসছি।"

আমি তার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলি—"ওঠো আলবের্ট। একবার যদি শুয়ে পড়, আর তুমি এগোতে পারবে না। এসো চটপট, আমি তোমার হাত ধরছি।"

অবশেষে আমরা একটা ছোটো গোফায় এসে পৌঁছই। ক্রোপ্ শুয়ে পড়ে আমি তার ক্ষত বেঁধে দি। তার হাঁটুর ঠিক উপরে গুলি লেগেছে। তারপর আমি নিজের দিকে চেয়ে দেখি—আমার পাজামা রক্তে ভিজে গেছে, হাতও তাই! আলবের্ট তার ব্যাণ্ডেজ বার করে আমার ক্ষত বেঁধে দেয়। এর মধ্যেই সে আর পা নাড়াতে পারছে না; আমরা দুজনেই অবাক হয়ে ভাবছি, এতটা পথ আমরা এলুম কি করে। একমাত্র ভয়ই এটাকে সম্ভবপর করেছে। যদি আমাদের পা দু-টুকরো হয়ে উড়ে যেত, তাহলেও বোধহয় আমরা নুলো পায়েই দৌড়তুম।

এখনও আমার একটু হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতা রয়েছে। আমি একটা চলন্ত অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ডাকলুম; তারা আমাদের তুলে নিলে। তার মধ্যে আহত লোকে ভরা। একজন সামরিক ডাক্তার ছিলেন, তিনি আমাদের বুকে একটা ধনুষ্টঙ্কারের ইঞ্জেক্শান দিয়ে দিলেন।

হাসপাতালে আমরা দুজনে পাশাপাশি শোবার ব্যবস্থা করে নিলুম। আমাদের জলো রকম খানিকটা সুরুয়া খেতে দিলে। আমরা চোঁ চোঁ করে লোভীর মতো সেটা খেয়ে ফেলি।

আমি বলি—"এইবার বাড়ির দিকে, আলবের্ট।"

সে বলে—"তাই আশা করা যাক, আমি কেবল জানতে চাই আমার আঘাতটা কি রকমের।"

যন্ত্রণা বেড়ে ওঠে। ব্যাণ্ডেজটাকে আগুনের মতো মনে হয়? গেলাসের পর গেলাস আমরা জল পান করে চলি।

ক্রোপ্ বলে—"হাঁটুর কতটা উপরে আমার লেগেছে?"
আসলে যদিও ইঞ্চিখানেক উপরে, কিন্তু আমি বলি—"অন্তত চার ইঞ্চি।"
সে একটু থেমে বলে—"আমি মন স্থির করে ফেলেছি। যদি ওরা আমার পা কেটে বাদ দেয়, আমি এ প্রাণ রাখব না। চিরজীবনের মতো খোঁড়া হয়ে থাকা অসহ্য?"
নানা ভাবনাচিন্তার মধ্যে আমরা সেখানে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করি।

সন্ধ্যার সময় আমাদের কাটাকুটি করার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমি ভয় পেয়ে ভাবতে থাকি—তাইতো, এবার কি করা উচিত। সকলেই জানে, একটু সুবিধে পেলেই ডাক্তার সার্জেনরা হাত পা কেটে বাদ দিয়ে দেয়। কারণ তাদের এত বেশি কাজের চাপ যে জোড়াতালির উপর জোড়াতালি দেওয়ার চেয়ে কেটে বাদ দেওয়া অনেক সহজ। আমার কেমেরিখের কথা মনে পড়ে। যাই ঘটুক, আমি কিছুতেই আমাকে ক্লোরোফর্ম করতে দেব না; যদি দুজন লোকের মাথাও ফাটিয়ে দিতে হয় তবুও না।
সার্জেন আমার ক্ষতের চারপাশে আঙুল চালাতে থাকেন, আমার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে।
—"অত ছেলেমানুষি কর কেন? ও সব বাছাপনা চলবে না এখানে—" বলে তিনি বিষম খোঁচাখুঁচি লাগান। ডাক্তারি অস্ত্রটা উজ্জ্বল আলোয় চমকাতে থাকে একটা হিংস্র জন্তুর মতো! দুজন আর্দালি আমার হাত ধরে আছে; কিন্তু ধস্তাধস্তি করে তাদের একজনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি সার্জেনের চশমা ভেঙে দেবার চেষ্টা করি। তিনি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যান।

—"বদমাস্‌টাকে দাও তো ক্লোরোফর্ম করে।" বলে তিনি গর্জে ওঠেন।
তখন আমি ঠাণ্ডা হয়ে বলি—"মাপ করুন, ডাক্তার মশাই, আমি আর নড়চড় করব না, আমায় ক্লোরোফর্ম শোঁকাবেন না।"
—"বহুৎ আচ্ছা।" বলে তিনি আবার তাঁর অস্ত্রটা তুলে নেন। দেখছি, তিনি আমার ঘা-টাকে উসকে দিচ্ছেন আর আমার দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছেন। মুখ বুজে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছি হাতের মুঠো প্রাণপণে চেপে ধরছি, মরব তবু কোনোমতেই একটু শব্দও আমি করব না।
তিনি ক্ষত থেকে এক টুকরো গোলার কুঁচি বার করে আমার দিকে ছুঁড়ে দেন। আমার আত্মসংযম দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন—"কাল তুমি বাড়ি ফিরে যাবে।" তারপর আমার ঘায়ে প্লাস্টার-পটি লাগানো হয়। যখন আবার ক্রোপের কাছে ফিরে আসি আমি বলি, "খুব সম্ভবত কাল একটা আহতদের জন্যে ট্রেন এসে পৌঁছবে। যাতে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারি ডাক্তারখানার সার্জেণ্ট-মেজরকে বলে তারই চেষ্টা করতে হবে।"
সার্জেণ্ট-মেজরকে দুটো ভালো সিগার ঘুষ দিয়ে আমি কথাটা ইঙ্গিতে জানাই। তিনি সিগারটা একবার শুঁকে বলেন—"আর আছে ?"
আমি বলি—"হ্যাঁ, আরও কয়েকটা আছে।" ক্রোপ্‌কে দেখিয়ে বলি —"ঐ যে আমার কমরেড, ওর কাছেও কয়েকটা আছে। কাল সকালে রেলগাড়ির জানালা গলিয়ে আপনাকে সেগুলো দিতে পারলে আমরা খুব খুশি হব।"
তিনি বুঝতে পেরে সেগুলোকে আর একবার শুঁকে বললেন—"বেশ তাই হবে!"
রাত্রে আমরা একটুও ঘুমুতে পারি না। আমাদের ওয়ার্ডে সাতজন মারা গেল। তাদের মধ্যে একজন শ্বাস ওঠবার আগে ভাঙা চড়া

গলায় ভজন গেয়ে ওঠে, আর একজন খাট থেকে জানালা অবধি হামাগুড়ি দিয়ে যায়। সে সেখানেই শুয়ে পড়ে, যেন শেষবারের মতো জানালার বাইরের জগৎটা একবার দেখে নিতে চায়।

আমরা স্টেচারে প্ল্যাটফর্মের উপর শুয়ে রেলগাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি পড়ছে, স্টেশনে একটা চালাও নেই। আমাদের পরিচ্ছদগুলোও বড় পাতলা। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে আমরা অপেক্ষা করছি।

সার্জেণ্ট-মেজর যেন মায়ের মতো করে আমাদের দেখছেন। আমি আমাদের মতলব তখনও ভুলিনি। এক-আধবার তাঁকে চুরুটের প্যাকেটটা দেখাচ্ছি। একটা চুরুট তাঁকে আগাম দিলুম। আর তার বদলে তিনি আমাদের একটা বর্ষাতির টুকরো চাপা দিয়ে রেখে গেলেন।

সকালে যখন গাড়ি এসে পৌঁছয় ততক্ষণ স্টেচারগুলো বৃষ্টিতে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। যাতে আমরা দুজনে এক গাড়িতে উঠতে পারি সার্জেণ্ট-মেজর তার ব্যবস্থা করে দেন। একদল রেড-ক্রশ নার্স! ক্রোপ্ নিচে শোয়, আমি তার উপরের বিছানায়।

আমি চেঁচিয়ে উঠি—“কি সর্বনাশ!”

সিস্টার জিগগেস করেন—“কি হয়েছে?”

আমি বিছানাটার দিকে তাকাই। দুধের মতো শাদা চাদর দিয়ে ঢাকা, ইস্ত্রির দাগ পর্যন্ত এখনও ওঠেনি। আর আমার গায়ের জামা প্রায় ছ’ সপ্তাহ ধরে কাচাই হয়নি—ধুলোকাদায় ময়লায় কিট-কিট করছে।

সিস্টার জিগগেস করেন—“আপনি কি নিজে নিজে উঠতে পারছেন না?”

আমি ঘামতে ঘামতে বলি—“তা পারছি, কিন্তু ঐ বিছানার চাদরটা আগে তুলে নিন!”

—"কেন ?"
আমি ইতস্তত করে বলি—"তাইতো, বিছানার চাদরটা যে—"
—"ময়লা হবে ? তাতে কিছু এসে যাবে না। আমরা আবার কেচে নেব !"
আমি ব্যস্ত হয়ে বলি—"না না, তা নয়, এত বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপযুক্ত আমি নই।"
—"আপনারা সেখানে থানার মধ্যে পড়ে থাকতে পারেন আর আমরা এখানে এক টুকরো কাপড় কেচে নিতে পারব না ?"
—"না, সে কথা বলছি না।"
—"কি বলছেন ?"
শেষটা নিতান্তই বলিয়ে ছাড়লে, বললুম—"গায়ের উকুনগুলোর কথা ভাবছিলুম।"
তিনি হেসে বললেন—"বেশ তো, আজকের মতো ওরাও একটু ভালো বিছানায় শুয়ে নিক।"
তবে চুকেই গেল। আমি এক লাফে বিছানায় উঠে পড়ে গায়ে চাদর টেনে দি।
গা ঢাকা চাদরের উপর একটা হাত এসে হাৎড়াতে থাকে। সার্জেন্ট-মেজর। তিনি সিগারগুলো নিয়ে চলে যান।
এক ঘণ্টা পরে আমরা টের পাই যে আমাদের গাড়ি ছেড়েছে।

জেগে জেগে রাত কাটাই। ক্রোপ্‌ও অস্থির হয়ে রয়েছে। লোহার উপর দিয়ে মসৃণ ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে ট্রেন চলেছে। ট্রেন চলেছে খুব আস্তে আস্তে। জায়গায় জায়গায় থামছে, ইতিমধ্যে যারা মারা পড়ছে তাদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অ্যালবের্টের জ্বরভাব হয়েছে। আমারও যন্ত্রণা হচ্ছে, আরও মুশকিল হচ্ছে প্ল্যাস্টারের তলায় এখনও উকুন রয়েছে। তারা কট-কট করে কামড়াচ্ছে অথচ চুলকোবার উপায় নেই।

আমরা দিনের বেলা ঘুমোই। জানালার ভিতর দিয়ে গ্রামের দৃশ্য ছবির মতো একটার পর একটা ভেসে যায়। তৃতীয় দিন রাত্রে আমরা হের্বস্টালে এসে পৌছই। আমি সিস্টারদের কাছে শুনি আলবের্টকে তার জ্বরের জন্যে পরের স্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হবে। আমি শুধোই—"এ ট্রেন কতদূর অবধি যাবে?"

—"কোলোন অবধি।"

আমি বলি—"আলবের্ট, আমরা এক জায়গাতেই নামব, দেখ তার বন্দোবস্ত করছি।"

একজন সিস্টার পাশ দিয়ে যাবার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে মুখচোখ ফুলিয়ে লাল করে ফেলি। তিনি থেমে বলেন—"তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?"

আমি গোঙিয়ে বলি—"হ্যাঁ, হঠাৎ কেমন—"

তিনি আমার বগলের তলায় একটা থার্মোমিটার দিয়ে চলে যান। এখন কি করা দরকার তা যদি না বুঝি তো এতকাল কাটের সাকরেদি করাই বৃথা।

বগলের তলায় থার্মোমিটারটা রেখে আঙুল দিয়ে ক্রমাগত টোকা দিতে থাকি। তারপর একটা ঝাঁকুনি দি। ১০০°২ ডিগ্রি অবধি উঠিয়েছি। কিন্তু এ যথেষ্ট হল না। সাবধানে একটা দেশলাই জালিয়ে ধরতেই একলাফে ১০১°৬ ডিগ্রি।

সিস্টার এসে পৌছতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে থাকি, শূন্যদৃষ্টিতে তাকাতে থাকি, বিছানার উপর ছটফট করতে করতে বলি—"আর আমি সহ্য করতে পারছি না।"

এক টুকরো কাগজে তিনি আমার নম্বর টুকে নেন।

আলবের্ট আর আমি এক স্টেশনে নেমে পড়ি।

একটা ক্যাথলিক হাসপাতালে আমরা দুজনে এক ঘরে থাকি। আমাদের মস্ত সৌভাগ্য যে একটা জায়গায় উঠতে পেরেছি। ক্যাথলিক রুগ্নাবাসগুলোর ভালো ব্যবহার এবং ভালো খাবারের জন্যে খ্যাতি আছে। আজ আর আমাদের পরীক্ষা করা হয় না, তার কারণ ডাক্তারের সংখ্যা বড়ো কম। প্রায়ই রবারের চাকাওয়ালা ট্রলি বারান্দা দিয়ে আনাগোনা করছে।

রাত্রে বড়ো গোলমাল হয়—কেউ ঘুমুতে পারে না। ভোরের দিকে একটু ঢুলুনি আসে। সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমি জেগে উঠি। দুয়োরটা খোলা রয়েছে, বারান্দা থেকে একটা শব্দ আসে। অপর সকলেও তাতে জেগে ওঠে। একজন রোগী, যে সেখানে দিন দুই ধরে রয়েছে, সে বুঝিয়ে বলে—"ঐখানে বারান্দায় সিস্টাররা রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। যাতে আপনারাও তার ভাগ পেতে পারেন তাই দরজাটা খুলে রাখা হয়।"

জিনিসটা যদিও ভালোর জন্যে করা হয়েছে, তবু আমাদের মাথা ধরে যায়।

আমি বলি—"কি জ্বালা! ঠিক যেই ঘুমটি এসেছে আর অমনি!"

সে জবাব দেয়—"এখানে যারা অল্পস্বল্প চোটটোট পেয়েছে তাদেরই আনা হয় কি না, সেই জন্যে ওরা এই রকম করে।"

আলবের্ট গোঙিয়ে ওঠে। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠি—"ওখানকার গোলমাল থামাও!"

এক মিনিট পরে একজন সিস্টার প্রবেশ করেন। একজন বলে—"দরজাটা বন্ধ করে দেবেন কি?"

তিনি বলেন—"আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তাই দরজা খুলে রাখা হয়েছে।"

—"কিন্তু আমরা যে ঘুমুতে চাই!"

তিনি হেসে বলেন—"ঘুমের চেয়ে ঈশ্বরের প্রার্থনা ভালো। তা ছাড়া সাতটা তো বেজে গেছে।"

আলবের্ট আবার গোঙিয়ে ওঠে। আমি খেঁকিয়ে বলে উঠি—"দরজা বন্ধ কর।"

তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন। আমাদের অভিযোগ তিনি বুঝতে পারেন না; বলেন—"আমরা যে আপনাদের জন্যেই প্রার্থনা করছি।"

—"তা হোক, দরজা বন্ধ কর।"

তিনি দরজা খোলা রেখেই চলে যান। প্রার্থনা চলতে থাকে।

আমি ক্রোধে অন্ধ হয়ে বলি—"আমি তিন অবধি গুণব, তার মধ্যে যদি বন্ধ না হয় তো যা হয় কিছু ছুঁড়ে মারব!"

আর একজন বলে—"আমিও!"

আমি পাঁচ অবধি গুণি। তারপর একটা বোতল তুলে নিয়ে লক্ষ্য করে দরজার ফাঁক দিয়ে বারান্দায় ছুঁড়ে দি। হাজার টুকরোয় সেটা চূর্ণ হয়ে যায়। প্রার্থনা থেমে যায়। একজন সিস্টার এসে আমাদের ভর্ৎসনা করতে থাকেন।

আমরা গর্জে উঠি—"দরজা বন্ধ করে দাও!"

তাঁরা পিছিয়ে যান। যিনি প্রথমে এসেছিলেন তিনিই সব শেষে ঘর ছেড়ে যান।

—"অবিশ্বাসী, নাস্তিক!" বলে তিনি দরজা বন্ধ করে দেন।

দুপুরবেলা হাসপাতাল পরিদর্শক এসে আমাদের তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি আমাদের গারদের ভয় দেখান। তাঁকে আমরা বকে যেতে দিই।

তিনি জিগগেস করেন—"কে বোতল ছুঁড়েছিল?"

আমি স্বীকার করব কি করব না এটা স্থির করবার আগেই কে একজন বলে—"আমি ছুঁড়েছিলুম।"

খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন লোক উঠে বসে। সকলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কেন ও স্বীকার করতে গেল!

—"তুমি?"

—"হ্যাঁ। অকারণে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে আমি বিরক্ত হয়েছিলুম, আমার মাথার ঠিক ছিল না।"

—"তোমার নাম কি?"

—"ইওসেফ্ হামাখের্।"

পরিদর্শক চলে যান।

আমরা সবাই উৎসুক হয়ে বলি—"কেন তুমি বললে যে তুমি ছুঁড়েছ? তুমি তো আসলে ছোঁড়োনি।"

সে বলে—"তাতে কিছু এসে যাবে না, আমার একটা পাগলামির ছাড়পত্র আছে।"

তখন আমরা বুঝতে পারি পাগলামির ছাড়পত্র যার আছে সে নিজের ইচ্ছামত যা-খুশি করতে পারে।

সে বুঝিয়ে বলে—"আমার মাথার খুলি অল্প ফেটে গিয়েছিল, সেই থেকে ওরা আমাকে একটা ছাড়পত্র দিয়েছে, তাতে বলেছে যে সময়ে সময়ে আমি এমন ব্যবহার করতে পারি যার জন্যে আমাকে দায়ী করা যাবে না। সেই থেকে আমি খুব মজায় আছি। কেউ আমায় বিরক্ত করতে সাহস পায় না।"

আমরা আনন্দে আত্মহারা হই। ইওসেফ্ হামাথের্ যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো আমরা যা-খুশি করতে পারি।

আমাদের ঘরে আটজন লোক। পেটের্—তার মাথায় কালো কোঁকড়া চুল ; তার ফুস্‌ফুস্ বেশি রকম জখম হয়েছে, তারই আঘাতটা সবচেয়ে খারাপ। তার পাশেই ফ্রান্টস্ ভেখ্‌টের—তার একটা হাতে গুলি লেগেছিল। প্রথমে চোটটা তত খারাপ বোধ হয়নি, কিন্তু তৃতীয় দিন রাত্রে সে আমাদের ডেকে ঘণ্টা টিপতে বললে, তার মনে হচ্ছে যেন শিরা ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে।

আমি জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দি। রাত্রের সিস্টার আসেন না। রাত্রিবেলা আমরা তাঁর উপর বড় বেশি অত্যাচার করছি, কারণ আমাদের টাট্‌কা ব্যান্ডেজ করা হয়েছে, যন্ত্রণা বড়ো বেশি হচ্ছে। কেউ তার পা-টা এ রকম ভাবে রাখতে চায়, ও রকম ভাবে, আর একজন জল খেতে চায়, অপর একজন বালিশটা ঠিক করে দিতে বলে। শেষটা মোটাসোটা বুড়ি নার্সটি বিরক্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে চলে যান। এবারেও তিনি ভাবছেন, আগেরই মতো তাঁকে ডাকা হচ্ছে, তাই তিনি আসছেন না।

আমরা অপেক্ষা করি। ফ্রান্টস্ বলে—"আবার বাজাও।"

আমি বাজাই। তবু তিনি দেখা দেন না। আমাদের এ তল্লাটে মাত্র একজন রাত্রের সিস্টার। হয়তো তিনি কোনো কাজে-অন্য ঘরে গেছেন। আমি জিগগেস করি—"ফ্রান্টস্, তুমি ঠিক বুঝছ তোমার রক্ত পড়ছে? তা নইলে আমাদের আবার গালাগালি খেতে হবে।"

"আমার ব্যাণ্ডেজ তো ভিজে গেছে। কেউ কি একটা আলো জ্বালতে পারে না?"

তারও উপায় নেই। আলোর চাবিটা দরজার কাছে, আমাদের মধ্যে কেউই উঠে দাঁড়াতে পারে না। আমি বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘণ্টার বোতাম ঘন ঘন টিপতে থাকি! হয়তো সিস্টার ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারাদিন ওঁদের এত খাটতে হয় যে ওঁরা আর পেরে ওঠেন না। তার উপর সেই অফুরন্ত উপাসনা!

পাগলামির ছাড়পত্র-ওয়ালা ইওসেফ্ হামাখের্ বলে—"একটা বোতল ছুঁড়ে ভাঙব?"

—"ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছে না যখন, ওটাই কি শুনতে পাবে?"

অবশেষে দরজাটা খুলে যায়। বৃদ্ধা মহিলাটি গজ গজ করতে করতে ঢোকেন। ফ্রাণ্ট্সের অবস্থা দেখে তিনি বলেন—"আমায় খবর দেওয়া হয়নি কেন?"

—"সেই থেকে ঘণ্টা বাজাচ্ছি, আমরা কি হাঁটতে পারি কেউ!"

অতি বিশ্রী রকম তার রক্তস্রাব হতে থাকে; সিস্টার ভালো করে পটি বেঁধে দেন। সকালবেলা আমরা তার মুখের দিকে তাকাই—তার মুখ শীর্ণ হলুদবর্ণ হয়ে গেছে অথচ সন্ধ্যাবেলায় সেই মুখ বেশ সুস্থ ছিল।

ফ্রাণ্টস্ ভেঁখ্টের আর শক্তি ফিরে পায় না। একদিন তাকে আমাদের ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়, আর সে ফিরে আসে না। ইওসেফ্ হামাখের সব বোঝে, সে বলে—"আমরা আর ওকে দেখতে পাব না। ওরা ওকে মুর্দো-ঘরে নিয়ে গেছে।"

ক্রোপ জিগগেস করে—"মুর্দো-ঘর? তার মানে?"

—"মুমূর্ষুদের ঘর।"

—"সে আবার কি?"

—"এই বাড়ির এক কোণে একটা ছোট্ট ঘর আছে; যে পটল

তোলবার যোগাড় করে তাকে ঐ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে ঘরে দুটি মাত্র বিছানা। সেই ঘরকে লোক মুমূর্ষুদের ঘর বলে।"

—"কিন্তু কেন এমন করে?"

—"হয়তো মরবার পর আর বেশি খাটতে হবে না তাই। ঐ ঘরের পাশেই শবাগার, সেটা একটা সুবিধে। তা ছাড়া অন্য রোগীরা যাতে চোখের সামনে মৃত্যু না দেখতে পায় এও বটে। আর ওরা ভালো করে পরিচর্যা করতে পারে।"

—"এ ঘরের কথা কি সবাই জানে?"

—"যারা এখানে অনেকদিন ধরে আছে তারা জানে।"

বিকেল বেলা ফ্রাণ্টস ভেথ্‌টের যে খাটে ছিল সেই খাটে নতুন রোগী আনা হয়। দু'দিন পরে সেই নতুন লোকটিকেও নিযে চলে গেল।

তারপর পেটব্-এর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। একদিন তার বিছানার পাশে এসে ট্রলি দাঁড়াল। সে শুধোয়—"কোথায়?"

—"ব্যাণ্ডেজের ঘরে।"

তাকে তুলে নেওয়া হল। কিন্তু সিস্টার একটা ভুল করলেন—যাতে দু'বার আসতে না হয়, হুক্ থেকে তার জামাটাও তুলে ট্রলির উপর রাখলেন। পেটব্ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে ট্রলি থেকে গড়িয়ে নেমে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল; বললে—"আমি এইখানেই থাকব।"

তারা তাকে ঠেসে ধরলে। সে ক্ষীণ গলায় চীৎকার করতে লাগল—"আমি মুর্দা-ঘরে যাব না!"

সিস্টার বললেন—"আমরা ব্যাণ্ডেজের ঘরে যাচ্ছি।"

—"তবে আমার জামাটা শুদ্ধু নিলে কেন?" সে আর কিছু বলতে পারে না; ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলে—"এইখানে থাকব।"

তারা কিছু না বলে ওকে ঠেলে নিয়ে চলে যায়। দরজার কাছে সে উঠবার চেষ্টা করে। তার কালো কোঁকড়ানো চুল দুলে ওঠে, তার চোখ জলে ভরা! হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—"আমি ফিরে আসব। আমি আবার ফিরে আসব!"

দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছি, কিন্তু কেউ কিছু বলিনে। শেষে ইওসেফ্ বলে—"ফিরে আসব অনেকেই বলেছে; যে একবার ওখানে যায় আর সে ফিরে আসতে পারে না।"

আমার ঘা অস্ত্র করা হয়, তার ফলে দু'দিন ধরে আমি বমি করতে থাকি। সার্জেনের সেক্রেটারি বলেন যে আমার হাড় কোনোমতেই মুখে মুখে জোড়া লাগতে চাইছে না। আর একজনেরও এই রকম বেডৌল হয়ে গেছে, ঘা মেরে তার হাড় আবার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বীভৎস ব্যাপার!

আলবের্টের অবস্থা বড়ো ভালো নয়। তার পা-খানা কেটে বাদ দিয়েছে। এখন সে কথা প্রায় কয়ই না। একবার বললে, তার রিভলভারটা পেলেই নিজেকে গুলি করবে।

একদল নতুন লোক এসে পৌঁছয়। আমাদের ঘরে দুজন অন্ধ আসে; তাদের মধ্যে একটি ছোকরা বেশ ভালো গাইতে পারে। খাওয়াবার সময় সিস্টাররা কখনও সঙ্গে ছুরি আনতেন না, কারণ সে একবার একটা ছুরি ছোঁ মেরে নেবার চেষ্টা করেছিল। এই সতর্কতা সত্ত্বেও এক ঘটনা ঘটে যায় সন্ধ্যাবেলা যখন তাকে খাওয়ানো হচ্ছে, হঠাৎ কিসের ডাকে সিস্টার প্লেট আর কাঁটা টেবিলের উপর রেখে চলে যান। সে এই সুযোগে হাৎড়ে কাঁটাটা তুলে নিয়ে সজোরে কলজের উপর বসিয়ে দেয়। তারপর একটা জুতো তুলে

নিয়ে প্রাণপণে কাঁটার উপর ঠুকতে থাকে। আমরা সাহায্যের জন্ম চীৎকার করে উঠতে তিনজন লোক এসে কাঁটাটা কেড়ে নেয়। ভোঁতা কাঁটাটা বেশ গভীর ভাবে ঢুকে গিয়েছিল। সে আমাদের সারারাত এমন গালাগালি দিতে থাকে যে আমরা ঘুমুতে পাই না। সকালবেলা তার চোয়াল আটকে যায়।

আবার খাট খালি হতে থাকে। দিনের পর দিন যন্ত্রণায়, ভয়ে, গোঙানিতে, আর মৃত্যুর ঘড়ঘড়ানিতে কেটে যায়। মুর্দা-ঘরে আর কুলোয় না। রাত্রে আমাদের ঘরের মধ্যেই লোক মরতে থাকে। এত মরতে থাকে যে সিস্টাররা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠেন না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরেব দরজা খুলে গিয়ে একটা চ্যাপ্টা ট্রলি ঘরের মধ্যে ঢুকতে থাকে। স্ট্রেচারের উপর পাংশুবর্ণ রোগা বিজয়ী পেটের্ খাড়া হয়ে বসে। সিস্টার আনন্দিত মুখে তাকে তার আগেকার বিছানায় তুলে রেখে চলে যান। সে মুর্দা-ঘর থেকে ফিরে এসেছে। আমরা বহুদিন থেকে ভাবছি সে মরে গেছে।

সে চারিদিকে চেয়ে বলে—"এখন ? এবার কি বলতে চাও ?"

ইওসেফকেও স্বীকার করতে হল, এরকমটি আর সে কখনও দেখেনি ! ক্রমে ক্রমে আমাদের দু'একজন সাহস করে উঠে দাঁড়াই। এদিকে ওদিকে ঘোরবার জন্যে আমাকে একজোড়া 'ক্রাচেস্' দেওয়া হয়। কিন্তু আমি সেগুলোকে বেশি ব্যবহার করি না। ঘরের মধ্যে যখন আসি, চলে বেড়াই, তখন আলবের্টের দৃষ্টি আমার অসহ্য লাগে। এমন অদ্ভুত চোখে চায় ! ওর সামনে আমার হাঁটতে বাধো বাধো ঠেকে, কাজেই আমি বারান্দায় বেরিয়ে যাই—সেখানে স্বাধীন ভাবে চলতে পারি।

পেটে, শির-দাঁড়ায়, মাথায় যাদের চোট লেগেছে আর যাদের

দু হাত কি দু পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তারা আমাদের নিচের তলায় থাকে। আমাদের ডান দিকের ওয়ার্ডে যারা চোয়ালে ঘা খেয়েছে, বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে, নাক কান বা গলায় আহত হয়েছে, তারা আছে। বাঁ দিকে যারা কানা, যাদের ফুসফুসে, পাছার গাঁটে বা তলপেটে ক্ষত হয়েছে তারা আছে। এইখানে এসে বোঝা যায় মানুষের দেহের কত জায়গায়ই না আঘাত লাগতে পারে!

এটা তো মাত্র একটা হাসপাতাল। এই রকম শত সহস্র হাসপাতাল জার্মানিতে আছে, শত সহস্র ফ্রান্সে আছে, শত সহস্র রাশিয়ায় আছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সভ্যতার জন্যে এত চিন্তা করলে, এত কাজ করলে, এত লেখা লিখলে; এই হাজার হাজার যন্ত্রণাগারের রক্ত-স্রোত বন্ধ করতে পারলে না—সমস্তই মিছে হল। একটা হাসপাতাল দেখলেই বোঝা যায় যুদ্ধ জিনিসটা কি!

কয়েক সপ্তাহ পরে আমাকে প্রত্যহ সকালে পা টেপাতে যেতে হয়। সেখানে ক্রমে ক্রমে আমি স্বাভাবিক ভাবে পা নাড়তে শিখি। আমার হাত বহু পূর্বেই সেরে গেছে।

নতুন নতুন আহতের দল এসে পৌছয়। এখন আর কাপড়ের তৈরি ব্যাণ্ডেজ আসছে না, শাদা ক্রেপ্ কাগজের ব্যাণ্ডেজ। ফ্রন্টে আর কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ নেই বললেই হয়।

অ্যালবের্টের কাটা পা বেশ শুকিয়ে আসছে। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে নকল পা তৈরি করবার জন্যে যাবে। সে আর বেশি কথা কয় না, আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। কথা কইতে কইতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে যদি আমাদের সঙ্গে এখানে না থাকত, এতদিনে আত্মহত্যা করে ফেলত।

এখন সে ভাবটা সামলে গেছে ; আমরা যখন স্ক্যাট্ খেলি সে অনেক সময় বসে বসে দেখে।

আমি যতদিন না বেশ সেরে উঠি ততদিনের জন্যে ছুটি পেয়ে যাই।

মা আর আমায় ছেড়ে দিতে চান না। তিনি ভারি কাহিল হয়ে পড়েছেন। গেলবারের ছুটির চেয়ে এবারের ছুটি আরও অনেক খারাপ লাগল। তারপর শহর ছেড়ে আবার আমাকে লাইনে যেতে হয়।

আমার বন্ধু আলবের্টের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বড় কঠিন হল। কিন্তু সময়-বিভাগে থাকতে থাকতে এ সব জিনিস অভ্যাস হয়ে যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমি যখন এসেছিলুম, তখন শীতকাল। তখন গোলা ফাটলে যে খট্‌খটে মাটির চাংড়া ছিট্‌কে উঠত তা এত শক্ত ছিল যে গোলার টুকরোরই মতো ছিল বিপজ্জনক; এখন গাছপালা আবার সবুজ হয়ে এসেছে। একদল লোক আছে যারা নিজের মনেই থাকে—ডেটেরিং তাদেরই দলের একজন। তার দুর্ভাগ্য সে একটা বাগানে একদিন একটা চেরী গাছ দেখতে পায়। আমরা তখন ফ্রন্ট থেকে আমাদের নতুন আখড়ায় ফিরছি, রাস্তার একটা মোড়ে ধবধবে শাদা ফুলে ছাওয়া পাতাশূন্য একটা চেরী গাছ ভোরের আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছিল। সন্ধ্যের সময় ডেটেরিংকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। শেষে সে চেরী ফুলের দুটো ডাল হাতে দেখা দিলে। আমরা তার সঙ্গে কিছু ঠাট্টা করলুম, বললুম—"বিয়ে করতে যাচ্ছ নাকি?" সে কোনো জবাব দিলে না, সেগুলো নিয়ে তার বিছানায় রাখলে। রাত্রে আমি একটা শব্দ শুনতে পাই; মনে হয় যেন কে জিনিসপত্র বাঁধছে। নিশ্চয় কিছু গোল হয়েছে এই ভেবে তার কাছে গেলুম। ডেটেরিং ভাব দেখালে যেন কিছুই হয়নি। আমি তাকে বললুম—"বোকার মতো কিছু একটা

করে বোঝো না, ডেটেরিং।"
—"আঃ না, না, দেখছ না আমার ঘুম হচ্ছে না তাই !"
আমি বললুম—"তুমি চেরীর ডালগুলো কি জন্যে এনেছ ?"
সে বললে—"আরও কয়েকটা চেরীর ডাল নিয়ে আসব ভাবছি।" তারপর একটু হেসে বললে—"বাড়িতে আমার প্রকাণ্ড চেরী গাছের বাগান আছে। যখন তাতে ফুল ধরে, খড়ের মাচান থেকে সে যা চমৎকার দেখতে ! এখন সেই সময় হয়েছে ।"
আমি বললুম—"তুমি হয়তো শিগগিরই ছুটি পাবে। তুমি আবার চাষা হয়ে বাড়ি ফিরেও যেতে পার ।"
সে ঘাড় নাড়লে, কিন্তু তার মন বহু দূরে চলে গেছে। এই সব চাষারা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন তাদের মুখের ভাব কেমন যেন খানিকটা আত্মহারা, খানিকটা বিহ্বল, খানিকটা বেকুব গোছের হয়ে যায়। তার চিন্তাস্রোত থেকে তাকে টেনে আনবার জন্যে আমি এক টুকরো রুটি চাইলুম। সে কোনো কথা না বলে আমায় দিলে। কেমন সন্দেহ হয়। সাধারণত ও একটু হাত-কষা। কাজেই আমি জেগে রইলুম। কিছুই ঘটল না, সকালে সে যেমনকার তেমনই রয়ে গেল।
সম্ভবতঃ সে দেখে থাকবে আমি তার উপর চোখ রেখেছি। কিন্তু পরের দিন রোল-কলের সময় তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। এক সপ্তাহ পরে আমরা খবর পেলুম সে সামরিক পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে—সে নাকি জার্মানির দিকে যাচ্ছিল। এর পর আর আমরা ডেটেরিং-এর কোনো খবর পাইনি।

মুলের মারা গেছে। একদিন সোজাসুজিভাবে তার পেটের মধ্যে

গুলি চলে যায়। সে আধঘণ্টা বেশ সজ্ঞানে এবং ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে বেঁচে ছিল।

মারা যাবার আগে সে আমার হাতে তার পকেট-বইটা দিলে; কেমেরিখের কাছ থেকে যে বুট জুতো জোড়া সে পেয়েছিল সে দুটোও আমার দান করে গেল। আমার পায়ে সেটা বেশ ফিট্ করেছে। ইয়াডেনকে আমি কথা দিয়েছি, আমার পরে সে পাবে।

আমরা ম্যুলেরকে মাটি চাপা দিলুম, কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে নিরুপদ্রবে থাকতে হবে না; কারণ আমাদের লাইন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। ওদের দিকে অনেক ইংরাজ এবং আমেরিকান সৈন্যদল এসে পড়েছে। ওদের কর্নড্ বিফ্ এবং শাদা পাঁউরুটি যথেষ্ট। অনেক নতুন কামান, অনেক উড়োজাহাজ এসেছে।

আর আমরা না খেয়ে খেয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছি। আমাদের খাদ্যদ্রব্য এত খারাপ এবং এত ভেজাল মেশানো যে খেয়েও আমরা সুস্থ থাকি না।

আমাদের কামানের গোলা খুব বেশি নেই, কামানের চোঙা গোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষয়ে গেছে, কোথায় গোলা পড়বে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই—কখনও কখনও হয়তো আমাদেরই মধ্যে এসে পড়ে। আমাদের ঘোড়া বেশি নেই, আমাদের সৈন্যরা বালক মাত্র, তারা বন্দুক পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারে না—কেবল পারে দলে দলে মরতে।

কাট্ বলে—"দেখতে দেখতে জার্মানি উজাড় হয়ে যাবে।"

কোনোদিন যে এ কাণ্ডের শেষ হবে এ আশাও আমরা ছেড়ে দিয়েছি। মনে হয় চিরদিনই এমনি চলতে থাকবে। হয় গুলি খেয়ে মর, নয় হাসপাতালে যাও; সেখান থেকে হাত কি পা কেটে বাদ দিয়ে বাড়ি ফিরতে পার ভালোই, নইলে আবার সেই ফ্রন্ট্ লাইনের পথে—এ ছাড়া আর কিছুই নেই!

ট্যাঙ্ক আগে একটা পরিহাসের জিনিস ছিল, এখন সেটা একটা যুদ্ধের অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা লম্বা সারি বেঁধে আসতে থাকে তখন আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যায়।

শত্রুদের যে পদাতিকরা আমাদের আক্রমণ করে তারা আমাদেরই মতো মানুষ। কিন্তু এই ট্যাঙ্ক—এরা যন্ত্র। এরা যেখানে যায়, ধ্বংস ছড়িয়ে দিয়ে যায়। গর্ত, গাড়া, উঁচু নিচু কিছুই তাদের বাধে না; দুর্ভেদ্য ইস্পাতের বর্ম পরা দৈত্যের মতো তারা মরা, আধমরা, আহত দেহগুলোকে পিষে ফেলে চলতে থাকে। এদের প্রকাণ্ড গঠনের কাছে আমাদের বন্দুকগুলো যেন দেশলাইয়ের কাঠি—কিছুই করতে পারে না।

গোলা, বারুদ, বিষাক্ত গ্যাস, ট্যাঙ্কের বহর—ভাঙ্-চোর, উপবাস, মৃত্যু—

আমাশা, জর-বিকার, সর্দি-কাশি, খুনোখুনি, দাহ, জীবনের অবসান—ট্রেঞ্চ, হাসপাতাল, কবর, স্তূপ—এ ছাড়া আর কি থাকতে পারে তা আমরা ধারণা করতে পারিনে।

একটা আক্রমণে আমাদের কোম্পানির সেনাপতি বের্টিঙ্ক ধরাশায়ী হলেন। যে সব ফ্রণ্ট লাইনের অফিসাররা ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যে সবার আগে এগিয়ে যেতেন তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। আমাদের সঙ্গে তিনি দুবছর ছিলেন—একটি আঁচড়ও তাঁর গায়ে লাগেনি, কাজেই শেষ পর্যন্ত এই রকম একটা কিছু আমরা আশা করেছিলুম।

বের্টিঙ্কের বুকে যখন আঘাত লাগল তার একটু পরে একটা গুলির টুক্‌রোয় তাঁর থুৎনি থেঁতো হয়ে যায়, সেই টুক্‌রোটাই লেএআরের পাছা চিরে বেরিয়ে যায়। লেএআর কোঁকাতে কোঁকাতে হাতে ভর

দিয়ে দাঁড়ায়। হু হু করে রক্ত বার হতে থাকে, কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে না।
রবারের থলির মতো মিনিট দুয়েকের মধ্যে সমস্ত রক্ত ঝরে গিয়ে যেন সে চুপসে সাবাড় হয়ে যায়।
সে যে স্কুলে এত ভালো অঙ্ক কষতে পারত, তা এখন আর কি কাজেই বা আসবে!

মাসের পর মাস কেটে যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। নর-শোণিতপাতের এমন ভীষণ সময় আর কখনও আসেনি। এখানে যারা আছে সবাই জানে যে যুদ্ধে আমরা হারছি। এ সম্বন্ধে বেশি কথা কেউ বলে না। আমরা কেবলই হটে যাচ্ছি; এ বিরাট আক্রমণের পর আমরা আর ফিরতি আক্রমণ করতে পারব না—আমাদের আর লোক নেই, হাতিয়ারও নেই।
তবুও যুদ্ধ চলতে থাকে—লোক মরতেই থাকে।
১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম-জীবন তার শূন্যপ্রায় ভাণ্ডটা নিয়ে এতটা বাঞ্ছনীয় আমাদের কাছে কোনোদিনও আর ঠেকেনি। আমাদের কুটির ঘেরা মাঠে পোস্ত গাছগুলো রাঙা ফুল ফুটিয়েছে; ঘাসের শীষে চিকণ গোল গোল ঘাসের পোকাগুলো বসে আছে; অস্পষ্ট গৃহকোণের উষ্ণতা, অন্ধকারের রহস্যে মোড়া গাছপালা, আকাশের তারা, ছল্ ছল্ জলস্রোত, স্বপ্ন আর এক টানা ঘুম!—ওগো জীবন, জীবন, জীবন!
১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল—ফ্রণ্টে ফিরে যাবার দুঃখ এমন মুখ বুজে আর কোনো দিন সহ্য করিনি। শান্তি এবং সন্ধির গুজব আকাশ বাতাসকে চঞ্চল করে তুলেছে। আমাদের অন্তঃকরণ তাই আজ আবার সেই ফ্রণ্টে ফিরে যেতে বেদনা পাচ্ছে।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল—গোলাগুলির মুখে এসে জীবন এত তিক্ত, এত আশঙ্কায় পরিপূর্ণ আর কখনও ঠেকেনি। গোলাবর্ষণের সময় মাটির মধ্যে বিবর্ণ মুখ লুকিয়ে এমন করে একটা চিন্তাকে আর কখনও আঁকড়ে ধরিনি—না! না! না গো! এই শেষ মুহূর্তে আর সয় না।
১৯১৮ সালের গ্রীষ্মঋতু—আশার বাতাস, অধীরতার হতাশার মর্মবেদনা, মৃত্যুর প্রকাণ্ড ভয় গোলাগুলিতে চষে ফেলা মাঠের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কেবল এই অর্থহীন প্রশ্ন—কেন? কেন এর শেষ হচ্ছে না? যুদ্ধ সমাপ্তির এই জনরব দিকে দিকে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে?

আজকাল এ দিকটায় এত বেশি উড়ো-জাহাজ এসে পড়েছে যে তারা খরগোস তাড়ানোর মতো এক এক জন মানুষকে তাড়া করতে আরম্ভ করছে। যদি একখানা জার্মান উড়ো-জাহাজ ওড়ে তো তার জায়গায় পাঁচখানা ইংলিশ এবং আমেরিকান উড়ো-জাহাজ এগিয়ে আসে। একজন ক্ষুধার্ত হতভাগ্য জার্মান সৈন্যের জন্যে পাঁচজন সুস্পষ্ট তাজা শত্রু আছে। জার্মানদের যেখানে একখানা পাঁউরুটি, ওদের সেখানে পঞ্চাশ টিন কর্নড্ বিফ্। আমরা যে ঠিক হেরে যাচ্ছি তা নয়, কারণ সৈনিক হিসাবে ওদের চেয়ে আমরা অনেক ভালো, অনেক অভিজ্ঞ; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সংখ্যাধিক্যে ওরা আমাদের দাবিয়ে দিচ্ছে।
খাবার আনতে গিয়ে কাট্ গুলির ঘায়ে পড়ে গেল। ছিলুম মাত্র আমরা দুই সঙ্গী—আমি তার ক্ষত বেঁধে দিতে লাগলুম। তার পায়ের সামনের হাড়টা থেঁতো হয়ে গেছে। কাট্ যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বলতে লাগল —"যুদ্ধ অবসানের মুখে পোড়া কপালে এই হল!"
আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি—"কে জানে এখনও কত দিন এই ধুন্ধুমার চলবে। এখনকার মতো তুমি তো বেঁচে গেলে—"

পা-টা থেকে হু হু রক্ত ছুটতে থাকে। কাটকে একলা ফেলে রেখে এখন স্ট্রেচার খুঁজতে যাওয়া চলবে না, তা ছাড়া কাছাকাছি বাহকদের ঘাঁটি কোথায় আছে, তাও আমি জানিনে। কাট্ হাল্‌কা মানুষ, কাজেই আমি তাকে পিঠে তুলে হাসপাতালের দিকে চললুম।

রাস্তায় দু'বার আমরা জিরোই। কাটের ভীষণ যন্ত্রণা হতে থাকে। আমরা বেশি কথা কই না। আমি জামার বোতাম খুলে দিয়েছি। ঘামছি আর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। বহনের পরিশ্রমে আমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে, তা হলেও আমরা চলেছি, কারণ জায়গাটা বড়ো বিপজ্জনক।

প্রায়ই দু'একটা গোলার তীক্ষ্ণ শব্দ পাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি চলেছি, কারণ কাটের দেহ থেকে মাটিতে রক্ত ঝরে পড়ছে। গোলা-ফাটার সময় আমরা যে ভালো করে আড়াল নিতে পারছি তাও নয়।

একটা ছোটো গাড়ায় আমরা বিশ্রাম করতে নামি। আমার বোতল থেকে একটু চা বার করে কাটের গলায় ঢেলে দি। নিজে একটা সিগারেট টানতে টানতে বলি—"কাট্, এইবার দুজনে বুঝি ছাড়াছাড়ি হয়।"

সে চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকায়।

আমি বলতে থাকি—"সেই হাঁস-চুরির কথা মনে পড়ে কাট্? আর আমি যখন নতুন রংরুট, তখন বারাক-এর মধ্যে থেকে তুমি কেমন করে আমায় বার করে এনেছিলে মনে আছে? সে তো প্রায় তিন বছর হয়ে গেল, না?"

সে ঘাড় নাড়ে।

আমার মনের মধ্যে নির্বান্ধবের বেদনা জাগতে থাকে। যখন কাট্‌কে নিয়ে যাবে আমার আর একজন বন্ধুও বাকি থাকবে না।

নিজেকে আমার অতি দুঃখী বলে মনে হয়। এই কাট্—আমার বন্ধু কাট্ আর কোনো মানুষকে এর মতো করে আমি জানিনে। আমার তিন বছরের সুখ-দুঃখের অংশীদার এই কাট্—এর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে-না—এ যে অসম্ভব।

আমি বলি—"কাট্, তোমার বাড়ির ঠিকানা আমায় দাও; আর এই নাও আমার ঠিকানা।"

এই বলে আমি তার ঠিকানা আমার নোট-বইয়ে টুকে নি। যদিও সে এখনও এখানে বসে আছে তবু নিজেকে কি রকম একলা একলা বোধ হচ্ছে। আমি কি নিজেই নিজের পায়ে গুলি বসিয়ে দিতে পারি না? যাতে দুজনে একসঙ্গে যেতে পারি!

হঠাৎ কাট্ ঘড্ ঘড্ শব্দ করে ওঠে, তার মুখ সবুজ হয়ে আসে। সে বলে—"চলো, এগিয়ে যাই।"

আমি এক লাফে উঠে দাঁড়াই। তাকে কাঁধে তুলে যাতে তার পায়ে বেশি ঝাঁকুনি না লাগে এমনি ভাবে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলি।

আমার গলা শুকিয়ে আসতে থাকে, আমার চোখের সামনে সব কিছু যেন নাচতে থাকে। তবু আমি টল্‌তে টল্‌তে এক রোখে চলতে থাকি। অবশেষে হাসপাতালে এসে পৌঁছই।

সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে কাট্‌কে নামিয়ে রাখি। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। কয়েক মিনিট পরে আমি উঠে দাঁড়াই। আমার হাত-পা তখনও কাঁপতে থাকে। আমার জলের বোতলটা বার করে এক ঢোক জল খেয়ে নি। যাক—কাট্ তবু রক্ষা পেলে।

এতক্ষণে আমার কানে মানুষের গলার শব্দ প্রবেশ করে।

একজন আর্দালি বলে—"এত খেটে বয়ে আনবার দরকার ছিল না।"

আমি বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকাই।

সে কাটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—"ও তো হয়ে গেছে!"

আমি বুঝতে পারি না। বলি—"ওর পায়ে গুলি লেগেছে।"

আর্দালি বলে—"হ্যাঁ, তাও লেগেছে বটে।"

আমি ঘুরে তাকাই। এখনও আমার চোখের ঝাপসা ভাব কাটেনি। আবার ঘাম হতে থাকে। আমি চোখ মুছে ভালো করে কাটের দিকে তাকাই—সে স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বলি—"অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

আর্দালি বললে—"আমি তোমার চেয়েও ভালো বুঝি—ও মরে গেছে।"

আমি ঘাড় নেড়ে বলি—"অসম্ভব। দশ মিনিট আগেও আমি ওর সঙ্গে কথা কয়েছি। ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।"

কাটের হাত এখনও গরম রয়েছে। আমি একটু চা দিয়ে তার রগটা মুছে দিয়ে ঘাড়ের কাছে হাত বুলোতে থাকি। হাতে চট্‌চটে কি একটা লাগে। হাত সরিয়ে নিয়ে দেখি রক্ত।

আর্দালি বললে—"দেখলে ?"

রাস্তায় আসতে আমার অজান্তে কাটের ঘাড়ে এক টুকরো গোলার কুচি এসে লেগেছিল। এতটুকু একটি ফুটো—ছোট্ট একটু কুচি এসে লেগেছে—কিন্তু এই যথেষ্ট, কাট্ মারা গেছে!

আস্তে আস্তে আমি উঠে পড়ি।

লান্স কর্পোরাল আমায় জিগগেস করেন—"তুমি কি ওর মাইনের খাতা আর জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাও ?"

আমি ঘাড় নাড়তে তিনি আমার হাতে সব দেন।

আর্দালিটার ধাঁধা লেগে যায়, সে বলে—"তোমার সঙ্গে তো ওর আত্মীয়তা নেই—আছে নাকি ?"

নাঃ, কাট্ আমার কেউ নয়!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শরতকাল। পুরোনো অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের মধ্যে বিশেষ কেউই আর বাকি নেই। আমাদের ক্লাশের সাতজনের মধ্যে কেবল আমিই টিকে আছি। সকলেই শান্তি আর সন্ধির কথা বলছে। এবারেও যদি তা মরিচিকার মতো মিথ্যে হয়ে যায় তো তারা ক্ষেপে উঠবে। আশা বড় উঁচুতে উঠেছে, একটা ওলট পালট না করে তাকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। যদি শান্তি না হয়, তাহলে বিপ্লব হবে। খানিকটা বিষাক্ত গ্যাস টেনে নেওয়ার ফলে আমি চোদ্দ দিন বিশ্রাম পেয়েছি। একটা ছোটো বাগানে সারাদিন আমি রোদ পোহাই। শীঘ্রই সন্ধি হবে—এখন আমিও একথা বিশ্বাস করি। তারপর আমরা বাড়ি ফিরে যাব। বাড়ি ফিরে যাব—এইখানেই আমার চিন্তাস্রোত বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কি হবে জানিনে। যা কিছু দেখেছি, যা কিছু ঘটে চলেছে, তারই শুধু একটা অনুভূতি আছে—জীবনের আকাঙ্খা, গৃহ-প্রীতি, রক্তলালসা, মুক্তির নেশা—কিন্তু জীবন একেবারে যেন উদ্দেশ্যহীন! যদি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমরা ঘরে ফিরতে পারতুম, আমাদের ক্লেশভোগ এবং অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিলুম তাতে একটা

ঝড় বইয়ে দিতে পারতুম! কিন্তু এখন আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিষ্পেষিত, চূর্ণবিচূর্ণ, দগ্ধ; আমাদের কোনো কিছুতে শিকড় গাড়ার সাধ্য নেই আমাদের সব আশা ছাই হয়ে গেছে, আজ ফিরে গিয়ে আমাদের হারানো পথ কোনো-মতেই আমরা খুঁজে পাব না।

কেউ আমাদের বুঝবে না—কারণ যে-সব মানুষ আমাদের আগে পৃথিবীতে এসেছিল তারা যদিও এই কয় বছর আমাদের সঙ্গেই এখানে কাটিয়েছে, তাদের সকলেরই ঘর আছে, একটা করে পেশাও আছে; তারা এখন তাদের সেই পুরোনো কর্মক্ষেত্রেই ফিরে যাবে, যুদ্ধের কথা তারা বিস্মৃত হবে। আর আমাদের পরে যারা এলো, তাদের কাছে আমরা একেবারে অজানা থাকব—তারা আমাদের একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে যাবে। এমন কি, নিজেদের কাছেও আমরা একটা অনাবশ্যক বাহুল্যের মতো হয়ে থাকব। আমাদের বয়স যেমন বাড়তে থাকবে, কেউ কেউ নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে, কেউ কেউ ভবিতব্যের পায়ে আত্মসমর্পণ করবে, আর অধিকাংশই হয়ে পড়বে বিভ্রান্ত! দিন কেটে যাবে, শেষে ধ্বংশের মধ্যে হবে আমাদের অবসান!

কিন্তু হয়তো আমি যা ভাবছি এ সবই আমার মন-খারাপ আর ভয়ের দরুন হচ্ছে। একবার সেই সারি সারি পপ্‌লার বীথির তলায় দাঁড়াতে পারলেই তাদের পত্রমর্মরের ধ্বনিতে এ সমস্ত দুঃস্বপ্ন ধুলোর মতো কোথায় উড়ে যাবে!

এখানকার গাছগুলো সোনার সাজে সেজেছে। পাহাড়ে আঁশফলগুলো পাতার আড়ালে লাল টকটক করছে। ধবধবে গাঁয়ের রাস্তাগুলি দিক্‌প্রান্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। আর খাবারের দোকানে দোকানে শান্তির জনরব যেন মৌচাকের গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছে!

আমি উঠে দাঁড়াই।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একদিন সারা ফ্রন্ট লাইন এত নিস্তব্ধ, এত শান্ত, যে, সেদিনকার যুদ্ধের রিপোর্টে কেবল এই কটি কথা লেখা হয়েছে—'ইম্‌ হ্বেস্‌টেন নিথ্‌ট্‌স্‌ নয়েস'—অর্থাৎ পশ্চিম সীমান্তে আর নতুন কিছু নেই। ঠিক সেই দিন সে ধরাশায়ী হল।

মাটির উপর সে উপুড় হয়ে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন ঘুমুচ্ছে। তাকে উল্টে ফেলে দেখা গেল, সে বেশি কষ্ট পায়নি; তার মুখে একটা প্রশান্তির ভাব—এতদিনে যে অবসান এসে পৌঁছল তাতে যেন সে আনন্দিত হয়ে উঠেছে।

শেষ

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

ছাপ্পান্ন বছর আগে জার্মান দেশে এরিখ মারিয়া রেমার্কের জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন আঠারো তখন ইউরোপে যুদ্ধ বেধে ওঠে। তিনি তখনও স্কুলে পড়ছেন; স্কুল ছেড়ে দিয়ে তাঁকে সৈনিকের দলে যোগ দিতে হয়, এবং সোজা ফরাসি দেশে যেখানে যুদ্ধ-ক্ষেত্র তারই ফ্রণ্ট লাইনে পাঠানো হয়।

চার বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল, এর মধ্যে তাঁর রুগ্না মায়ের মৃত্যু ঘটে এবং যুদ্ধে তাঁর সমস্ত বন্ধুরা মারা যান। রেমার্ক দৈববলে বেঁচে যান বটে, কিন্তু লড়াই থেকে ফিরে এসে দেখেন যে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন।

শান্তি এবং বিশ্রামের জন্যে তিনি এক গ্রাম্য স্কুলে মাস্টারি নেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে নানা রকমের কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িত করেন। এই সময় লটারিতে রেমার্ক বেশ কিছু টাকা পান, সেই টাকায় নানা দেশে ঘুরে বেড়ান। ফিরে এসে তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর বন্ধুদের যুদ্ধক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাই লিখতে আরম্ভ করেন।

কালে এই বই 'ইম্ হ্বেস্‌টেন নিখট্‌স্ নয়েস' নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে এক বছরের মধ্যে মোট বাইশটি ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিছুদিনের মধ্যে কি কি ভাষায় কত 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট' বিক্রি হয়েছিল তার একটা হিসেব দিচ্ছি—

জার্মান	৯,৫০,০০০	সুইডিশ	৫৫,৫০০
আমেরিকান	৪,২০,০০০	স্পানিশ	৫০,০০০
ইংরাজি	৩,০০,০০০	হিব্রু	৫০,০০০
হাঙ্গেরিয়ান	১,০০,০০০	চেক	৩৫,০০০
রাশিয়ান	১,০০,০০০	রুমেনিয়ান	৩০,০০০
ঈডিশ	১,০০,০০০	ফিনিশ	২০,০০০
ডেনিশ-নরোয়েজান	৬৫,০০০	লেটিশ	২০,০০০
ডাচ	৬১,০০০	অন্যান্য সংস্করণ	২০,০০০